Contents

মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০৮

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১১তম বর্ষ আগস্ট ২০০৮ ইং ১১তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

কুয়েত-সঊদী আরব থেকে বাংলাদেশী শ্রমিক বহিষ্কারঃ অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা

কুয়েত-সঊদী আরব থেকে বহিস্কৃত হয়ে শত শত বাংলাদেশী শ্রমিক কপর্দকহীন অবস্থায় কেউবা এক কাপড়ে, কেউবা নগ্নপায়ে, কেউ আহত অবস্থায় রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ফিরে এসেছে দেশে। বুকভরা আশা নিয়ে সহায়-সম্বল বিক্রি করে একদিন এরা পাড়ি দিয়েছিল কুয়েত-সঊদী আরবে। দেশ ত্যাগের সময় বিমান বন্দরের কনকর্স হলে স্বজনরা চোখের পানি ফেলে তাদের বিদায় জানিয়েছিল বেদনাবিধুর হৃদয়ে। স্বজনরা ভেবেছিল একদিন তারা পকেট ভরে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে দেশে ফিরবে। অভাবের সংসারে আসবে অনাবিল আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু সবকিছুই এখন হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বজনরা তাদের অভ্যর্থনা জানাতে বিমান বন্দরে হাযির হয়নি। ফ্লাইট থেকে নীরবে নেমে চোখের পানি ফেলে বিমানবন্দর থেকে যে যার মত ফিরে গেছে নিজ বাড়িতে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশ কুয়েত বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ বা বন্ধু রাষ্ট্র। সে দেশের সেবাখাতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য ও সুনাম-সুখ্যাতি রয়েছে। সঊদী আরব ও মালয়েশিয়ার মত বৃহৎ শ্রমবাজারের প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকরা গত ২৬ জুলাই সহিংস আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সেদেশের সরকার এ পর্যন্ত ৩১৩ জন শ্রমিককে ফেরৎ পাঠিয়েছে, আরো হাযার হাযার শ্রমিককে ফেরৎ পাঠানোর জন্য বিমান বন্দরে জড়ো করা হচ্ছে। এদিকে প্রায় একই সময়ে আইন লঙ্ঘন, পাসপোর্ট ও ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া অবস্থানের অভিযোগ এনে সঊদী সরকারও সেদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে ২৭৫ জন বাংলাদেশীকে।

কুয়েতের শ্রমিক ধর্মঘটে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশের শ্রমিকরা যোগ দিলেও আন্দোলনরত অধিকাংশ শ্রমিক বাংলাদেশী হওয়ায় মূলত বাংলাদেশীদের প্রতিই কুয়েত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, কাজের ও থাকার ব্যবস্থা উন্নতকরণ, ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন পরিশোধ, ভিসা নবায়নের জন্য মালিক পক্ষ থেকে ফি প্রত্যাহার, দুই বছর অন্তর ছুটিতে যাওয়ার জন্য টিকিট, কোম্পানীতে কর্মরত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশী শ্রমিকদ অধ্যুষিত কুয়েতের হাসাবিয়া এলাকায় শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। এর জের ধরেই ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা। কুয়েত সরকার নিরীহ বাংলাদেশী শ্রমিকদেরকে ঠেলে দেয় নিজ দেশে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশী শ্রমিকরা কুয়েতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার পিছনে এদেশীয় কিছু অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগদাতা সংস্থার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। এমনিতেই বাংলাদেশী শ্রমিকদের অনেক কম মজুরীতে নিয়োগ দেয়া হয়, আবার অধিকাংশ নিয়োগদাতা

Contents

প্রতিশ্রুত মজুরীও শ্রমিকদের দেয় না। জানা যায়, কুয়েতের কিছু জনশক্তি নিয়োগদাতা সংস্থা বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কোম্পানীতে শ্রমিক যোগান দিয়ে জনপ্রতি ৮৫ দীনার আয় করলেও ঐসব শ্রমিকদের দেয় মাত্র ২০ দীনার। যদিও ৫০ দীনার বেতন দেয়ার কথা বলে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ঐ ২০ দীনার থেকে নিয়োগদাতারা আবার ১২ দীনার করে কেটে রাখে 'ভিসা রেসিডেন্স চার্জ'-এর নাম করে। ভিটে-মাটি বিক্রি করে, ধার-দেনা করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ করে দীনার-দেরহাম উপার্জনের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিদেশে গিয়ে মাসিক মাত্র ৮ দীনার (২৬০×৮=২০৮০/=) আয় করে নিজে চলবে কিভাবে এবং চাতকের ন্যায় অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকা দেশের স্বজনদের জন্যইবা পাঠাবে কি?

আমরা জানি, বঞ্চিত মানুষমাত্রেরই মনে সর্বদা ক্ষোভের বহ্নি ধিকিধিকি জ্বলে। তাই বলা হয়, অ যঁহমৎ সধহ রং ধহ ধহমৎু সধহ 'ক্ষুধার্ত মানুষমাত্রই একজন ক্রুদ্ধ মানুষ'। এরপরও জীবনে সফলতা লাভ করতে হ'লে সংযমী বা ধৈর্যশীল হওয়ার কোন বিকল্প নেই। সচেতনভাবে আমাদেরকে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে কোন কাজটা দেশ, জাতি ও আমার নিজের জন্য মঙ্গলজনক। স্বল্প জনসংখ্যার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কুয়েতে আমাদের দেশের ২ লক্ষাধিক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আমাদের জাতীয় আয়ের একটা বৃহদংশ আসে সেখান থেকে। এমতাবস্থায় কোন স্বার্থদুষ্ট ও কুচক্রী মহলের দুরভিসন্ধির খপ্পরে পড়ে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন কোন অপরিণামদর্শী আচরণ করা আদৌ উচিত নয়, যাতে আমাদের সম্পর্কে ঐসব দেশের কর্তৃপক্ষের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়ে আমাদের শ্রমবাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এই ফাঁকে প্রতিবেশী সুযোগসন্ধানীরা সে সুযোগ হাতিয়ে নেয়। কেননা বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানী খাত বছরে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। অথচ এ অর্জনের মূলশক্তি শ্রমিকরা যখন বিদেশে প্রতারিত, বিপদগ্রস্ত কিংবা নির্যাতিত হয়ে দুর্দশার শিকার হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রে সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনের একশ্রেণীর কর্মকর্তা শ্রমিকদের সমস্যা নিরসন ও দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে আসার পরিবর্তে প্রতারক এজেন্টদের গোপনে সাহায্য করে বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ বিদেশে দূতাবাস ও মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে প্রতারিত ও বিপদগ্রস্ত শ্রমিকদের সাহায্যে ত্বরিৎ এগিয়ে আসা। প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সঙ্গে আলোচনা ও দেন-দরবার করার দায়িত্বও তাদের। অতীতের সকল তিক্ত অভিজ্ঞতার চির অবসান ঘটিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস ও মিশনগুলি সচেতনভাবে সময়মত এগিয়ে আসবে এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

উল্লেখ্য যে, জনশক্তি রফতানী বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। আর বাংলাদেশের রেমিটেন্স আয়ের সবচেয়ে বড় বাজার মধ্যপ্রাচ্য। গত ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে দেশে রেমিটেন্স এসেছে ৭৯১ কোটি ৪৭ লাখ মার্কিন ডলার (৫৫ হাযার ৩৯৮ কোটি টাকা) এবং দেশে রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৮টি দেশ সঊদী আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, কাতার, ওমান, বাহারাইন, কুয়েত, লিবিয়া ও ইরান থেকে এসেছে ৪৯৭ কোটি ৫৩ লাখ মার্কিন ডলার (প্রায় ৩৫ হাযার কোটি টাকা)। এর মধ্যে শুধু সঊদী আরব ও কুয়েত থেকেই এসেছে ৩১৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার, যা গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ৬৪ শতাংশ। শুধু সঊদী আরব থেকে ১৬ হাযার ২৬৪ কোটি এবং কুয়েত থেকে এসেছে ৬ হাযার ৪১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। এদিকে মধ্যপ্রাচ্য ব্যতীত সারা বিশ্ব থেকে রেমিটেন্স এসেছে ২৯৩ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলার। এর পূর্বে গত ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে মোট রেমিটেন্স এসেছিল ৫৯৭ কোটি ৮৪ লাখ ডলার। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য থেকে শ্রমিক ফেরৎ পাঠানো অব্যাহত থাকলে দেশের রেমিটেন্স প্রবাহে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে পড়তে পারে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব। হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে ৩৫ হাযার কোটি ডাকা অর্জনের বিশাল শ্রমবাজার।

অতএব বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার অন্যতম প্রধান খাত রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে জনশক্তি মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও ব্যক্তিকে আরো আন্তরিক, সচেতন ও কর্মতৎপর হ'তে হবে। বৃদ্ধি করতে হবে তাদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা। সেই সাথে বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এ দেশের দূতাবাসগুলোকে অনেক সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব দূতাবাসে কূটনীতিকদের পাঠানোর পূর্বে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে গ্রহণ করতে হবে। দূতাবাসগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিন তদারকি নিয়মিত এবং জোরদার করতে হবে। দেশী রিক্রুটিং এজেন্সি ও প্রবাসে অবস্থানরত তাদের সঙ্গী দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করে সংক্ষিপ্ত আদালতে তাদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশে গমনেচ্ছুদেরকে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানূন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান এবং তাদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, থাকা ও কাজের পরিবেশ সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেই কেবল বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, কুয়েত সরকার বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় চুক্তিবদ্ধ কোম্পানীগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের মাসিক বেতন ন্যূনতম ১৫০ দশমিক ৪ ডলার নির্ধারণ করেছে। তাছাড়া শ্রমিক ও গৃহপরিচারিকাদের উপর নির্যাতনের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ বছর কারাদণ্ডের সুপারিশ সহ একটি আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এজন্য আমরা সেদেশের সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং গৃহীত পদক্ষেপগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় করুন-আমীন!!

তাক্বওয়া অর্জন ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে ছিয়ামের ভূমিকা

ডঃ এস.এম. আব্দুস সালাম*

‘ছওম’ (صوم) বা ‘ছিয়াম’ (صيام)-এর আভিধানিক অর্থ পরিহার করা বা বিরত থাকা। শরী‘আতের পরিভাষায় ছুবহে ছাদিকের পূর্ব হ’তে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছওয়াব ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম হ’তে বিরত থাকার নাম ছিয়াম। আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর রামাযানের পুরো একমাস ছিয়াম ফরয করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে’ *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। আল্লাহ পাক আরও বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্যে যে সেই মাসকে পায় সে যেন ছিয়াম রাখে’ *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। অনুরূপভাবে হাদীছেও রামাযানের ছিয়াম ফরয হবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ক) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক্ব) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল (খ) ছালাত কায়েম করা (গ) যাকাত প্রদান করা (ঘ) হজ্জ সম্পাদন করা ও (ঙ) ছিয়াম পালন করা’।[১]

ছিয়াম আল্লাহ্‌র একটি বড় নি‘আমত। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য রামাযানের পুরো এক মাস ছিয়াম পালনের বিধান প্রদান করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি একটি বড় দয়া প্রদর্শন করেছেন। এ ছিয়াম পালনের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি, প্রবৃত্তির প্রতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং ইবাদতের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করার শক্তি অর্জিত হয়। ছায়েম তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির গুণে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে। এর দ্বারা তাক্বওয়া অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণী,

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু বা মুত্তাক্বী হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

* *প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৪ ‘ঈমান’ অধ্যায়।*

আল্লাহভীতি অর্জনের জন্য রামাযানের ছিয়াম হ’ল এক মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স। এ কোর্সের ট্রেইনার বা প্রশিক্ষক স্বয়ং আল্লাহপাক। আর ট্রেইনী বা প্রশিক্ষণার্থী হ’ল মুমিন বান্দা। এর সিলেবাস (পাঠ্যসূচী) প্রধানত আল্লাহভীতি অর্জন। মানুষের জীবন চলার পথে এক অবক্ষয়ী ফাঁদ পেতে আছে কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, হিংসা, মোহ ইত্যাদি। তার জীবন স্বভাবে চিরন্তন এক সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরতিহীন সংগ্রামে সে লিপ্ত। ষড় রিপুর পাতানো অনেক জানা-অজানা বিপত্তির কুটিল আবর্তে প্রতিনিয়ত সে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই আমরা দেখতে পাই, উইল ফোর্স বা ইচ্ছাশক্তি যেদিকে প্রবল হয় সেটাই জয়ী হয়। ছিয়াম সাধনা মানুষের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উইল ফোর্সকে প্রবল করে এবং ষড় রিপুর সকল ক্ষতিকারক দিককে পরাজিত করে দেয়।

তাক্বওয়া অর্থ ভয় করা। তবে ইসলামের পরিভাষায় তাক্বওয়ার অর্থ হ’ল, আল্লাহ্‌র ভয় মনে স্থান দেয়া ও সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যার মধ্যে এই ভীতি সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। আল্লাহপাক মুত্তাক্বীদেরকে ভালবাসেন। মুত্তাক্বীদের উদাহরণ দিতে গিয়ে উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, ‘আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথে চলেননি’? তদুত্তরে তিনি বলেছেন, ‘হ্যাঁ’। উবাই বললেন, ‘এমতাবস্থায় আপনি কিভাবে পথ অতিক্রম করেছেন’? জবাবে ওমর (রাঃ) বলেছেন, কাপড় গুটিয়ে নিয়েছি ও কাঁটা থেকে বেঁচে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি। উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) বললেন, ‘এটাই তাক্বওয়া’।[২]

মানবাত্মা প্রতিনিয়ত যখন ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থেকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয় কিংবা অসংযত হয় তখন এগার মাস পর রামাযানের এক মাস ছিয়াম পালনের মাধ্যমে সেই অবাধ্য আত্মাকে ক্ষুধার কষ্টে নাজেহাল করে দেবার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে আত্মার যে অবাধ্য ভাব তা দূরীভূত হয়। মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিয়ামের এ ব্যবস্থা তাই সর্বজন স্বীকৃত একটি ব্যবস্থা। কেননা ক্ষুৎ-পিপাসার মাধ্যমে পার্থিব ও নশ্বর শরীরে ক্লেশ দানের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে লাগাম দেয়া সম্ভব। শারীরিক কষ্টে নিপতিত না হ’লে যে প্রবৃত্তি বা পশুবৃত্তিকে দমন সম্ভব নয়- একথা পরীক্ষিত সত্য। তাই ছিয়াম পালনের দ্বারা মানুষ এক সীমাহীন নৈতিক ও আত্মিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে দু’প্রকার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। একটি হ’ল পাশবিক বৈশিষ্ট্য, অপরটি হ’ল ফেরেশতাসুলভ শক্তি বা বৈশিষ্ট্য। পাশবিক স্বভাব মানুষকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত ও সংযমহীন করে গড়ে তোলে। এর ফলেই সমাজে নানা দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। কেননা এক

Contents

২. *তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রো: মাকতাবাতুছ ছফা, ২০০৪), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭।*

শ্রেণীর অসংযমী-উচ্ছৃঙ্খল লোক অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং সীমালংঘন করে। অতএব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের স্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। ছিয়াম এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ছিয়াম মানুষের পাশবিক শক্তিকে পরাজিত করে দেয় এবং ফেরেশতাসুলভ শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে জাগ্রত এবং শক্তিশালী করে। কেননা মানুষ তার পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ছিয়ামের মাধ্যমে যে ক্ষমতা অর্জন করে, অন্য কোন ইবাদত দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। কারণ বস্তুগত চাহিদার আধিক্য মানুষের নৈতিক মান খর্ব করে এবং তাকে পার্থিবতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। পার্থিব জৌলুস বৃদ্ধির জন্য সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর এই জৌলুস বৃদ্ধির জন্য যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করার জন্য তার মস্তিষ্ক ও শ্রম দারুণভাবে নিয়োজিত থাকে। যেহেতু বস্তুগত চাহিদার কোন শেষ সীমা চিহ্নিত নেই, সেহেতু এই পথে তার ধাবমানতা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এমনকি এটি তাকে ক্ষেত্রবিশেষে নীতি-নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করতেও বাধ্য করে। বস্তুগত উপকরণ আহরণের ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি বৃদ্ধি পেলেও নৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার অধোগতি প্রকট হয়ে উঠে। এ কারণেই মানুষের বস্তুগত চাহিদার আধিক্যের মুখে লাগাম লাগানো প্রয়োজন। এই লাগাম লাগানোর কাজটি তখনই সম্ভব হ'তে পারে, যখন তার মন-মানসিকতায় বস্তুগত উপকরণের মোহ হ্রাস পাবে। আর বস্তুগত উপকরণের মোহ হ্রাস করার ক্ষেত্রে ছিয়ামের ভূমিকা অসাধারণ।

ছায়েম প্রতিদিন ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অথচ সারাটি দিন তার দেহ বিভিন্ন রকমের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে চায়। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার জন্য তার অন্ননালী উন্মুখ হয়ে থাকে। সাজানো খাদ্যের দিকে দৃষ্টি গেলে অথবা রান্না করা খাদ্যের সুঘ্রাণ নাকে এলে খাদ্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও সে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ এটিতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের নিষেধাজ্ঞা আছে। এ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করলে আল্লাহ পাক তাকে শাস্তি দেবেন এটা সে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় তার মধ্যে এত প্রবল হয় যে, সে কখনও এর ধারে কাছেও ভিড়ে না। ফলে তার ভোগের কামনা প্রদমিত হয় এবং নৈতিক ভাবধারা প্রাধান্য পেতে থাকে। বস্তুগত উপকরণ ভোগের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হয়। এভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার আগ্রহ তার মাঝে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এই আত্মিক শক্তিই মানুষকে মানুষ বানায়। মানুষকে আল্লাহ্‌র গোলাম হিসাবে জীবন যাপন করতে এবং আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে কর্তব্য পালনে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে।

ছিয়াম এমন একটি ইবাদত যার মধ্যে 'রিয়া'র (লোক দেখানো আমল) কোন স্থান নেই। ছিয়াম রিয়ামুক্ত আমলের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্স। ছিয়াম ছাড়া অন্যান্য যেসব ইবাদত আছে, তা পালন করার জন্য কোন না কোন রূপে বাহ্যিক প্রকাশের আশ্রয় নিতে হয়। যেমন ছালাত আদায়ের সময় মুছল্লীকে উঠা-বসা ও রুকূ-সিজদা করতে হয়। সেটা অন্য লোক দেখতে পারে। কিন্তু ছিয়াম এ রকম নয়। এটা কাউকে দেখানো যায় না। এর মধ্যে তাই আল্লাহভীতি খুবই প্রবল। এ কারণেই হাদীছে কুদসীতে এর পুরস্কার অনেক বেশী দেবার কথা ঘোষিত হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম এর ব্যতিক্রম। কেননা ছিয়াম একমাত্র আমার জন্যই রাখা হয়। আর আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব (আমার যত ইচ্ছা)। বান্দা নিজের প্রবৃত্তির দাবীকে অগ্রাহ্য এবং পানাহার পরিহার করে আমারই জন্য'।[৩]

ইবাদতে রিয়া প্রদর্শন করা ছোট শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত আমল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ. 'আমি তোমাদের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে ছোট শিরক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া বা লোকদেখানো আমল করা'।[৪] এজন্য কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে চাইলে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করতে চাইলে তার উচিত রিয়ামুক্ত আমল করা ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

---

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৪. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩৩৪ 'মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫১, সনদ জাইয়িদ।*

ছিয়াম রিয়ামুক্ত আমল হবার কারণে এই আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ সহজে হয়ে থাকে। একজন ছায়েমের ছিয়ামের খবর একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কোন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ছায়েম শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যই ছিয়াম পালন করে থাকে। আর তাই সে অসহ্য গরমে পিপাসার্ত হয়ে কলিজা ফেটে গেলেও একফোটা পানি পান করতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লেও খাবার মুখে দেয় না। কারণ সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক তাকে দেখছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

'তুমি এমনভাবে ইবাদত কর, যেন আল্লাহ্‌কে দেখছ, যদি তুমি দেখতে না পাও তাহ'লে অন্ততপক্ষে মনে করবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৫]

ছিয়ামের এই অসাধারণ মাহাত্ম্য আছে বলেই ঈমানদার বান্দা ছিয়ামের পুরোপুরি হক্ব আদায় করে ছিয়াম রেখে থাকে। গীবত, মিথ্যা কথা, চোগলখুরী ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থেকে একজন মুমিন বান্দা ছিয়ামকে সুন্দর করে তোলে। ফলে এই ছিয়াম পরকালে তার জান্নাতে থাকার জন্য সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ، فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ.

'ছিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার বিষয়ে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, হে পরওয়ারদিগার! তাকে আমি রাত্রিবেলায় নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক উভয়ের সুপারিশ কবুল করবেন'।[৬]

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে এবং তাক্বওয়া অর্জনে ছিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। তাই আমাদের জন্য এটা একান্তভাবে করণীয় যে, রামাযানের ছিয়াম ছাড়াও বছরের অন্যান্য দিনগুলোতেও সুন্নাত, নফল ইত্যাদি ছিয়াম রাখা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। আমরা যদি ছিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে বশে এনে নিজেদের জীবনকে তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত করতে পারি তবেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হব। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে মুত্তাক্বী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

---

৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।
৬. বায়হাক্বী, আহমাদ; মিশকাত হা/১৯৬৩ 'ছওম' অধ্যায়; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/৫৭৯, হা/৯৮৪, সনদ হাসান ছহীহ।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুন ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৬] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৭]

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৫. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৬. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৭. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত।[৯]

৬. ছালাতুত তারাবীহঃ ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ **১১** রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত **১১** রাক'আতের বেশী ছিল না।[১০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে **১১** রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ) -এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১২]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৩] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৪]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৫] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৬]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৭] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত **১২** তাকবীর দেওয়ার সুন্নাত।[১৮] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৯]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২০] (খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২১] (গ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৩] (ঘ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৪]

---

৮. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৯. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
১০. বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।
১১. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১২. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১৩. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।
১৪. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১৫. মিশকাত হা/১৩০২।
১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৮. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৯. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
২০. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২১. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২২. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২৩. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৪. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

ভারতীয় পানি আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ

*ডঃ তারেক শামসুর রহমান**

বাংলাদেশ ভারতের পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন। বাংলাদেশকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে ভারত। ভারতের এ 'পানি আগ্রাসন' একদিকে যেমন বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, অন্যদিকে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভারত বাংলাদেশকে 'চাপ' এর মুখে রেখে তাদের স্বার্থ আদায় করে নিতে চাইছে। ভারতের এ সূদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করছে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিতে কর্মরত কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মকর্তা। বাংলাদেশের পানি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী নয় ভারত। বাংলাদেশ যখন পানির অভাবে বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, ঠিক তখনই ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার বললেন উল্টো কথা। বললেন, বাংলাদেশের পানির প্রাপ্যতা কোন সমস্যা নয়। বড় সমস্যা হ'ল পানির ব্যবস্থাপনা।[১] এ মন্তব্য থেকেই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে যায়। ভারত বাংলাদেশের এই 'জীবন মরণ সমস্যাকে কোনদিন সমস্যা হিসাবে দেখেনি; বরং উপহাস করেছে। যেখানে সার্ক-এর আওতায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানের একটি উদ্যোগ নেয়া যেত, সেখানে তা না করে সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে ভারত তার স্বার্থ উদ্ধার করে নিতে চায়।

বাংলাদেশে প্রবাহিত অধিকাংশ নদীর উৎস্থল হচ্ছে ভারত। ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবাহমান নদীর সংখ্যা ৫৪টি। ভারত শুধুমাত্র গঙ্গার পানিই এককভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে না; বরং ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পানিও প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে। ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার মাধ্যমে ভারত ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে নেবে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য হবে এক বড় ধরনের হুমকি। আর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ হ'লে, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল পরিণত হবে মরুভূমিতে। ভারতের এ 'পানি আগ্রাসন' আজ বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে বড় ধরনের ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দিয়েছে। ভারত আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে বাংলাদেশকে তার পানির ন্যায্য পাওনা থেকে শুধু বঞ্চিতই করছে না; বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

** প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. ডেসটিনি, ৭ মে ২০০৮।

গঙ্গা পানি চুক্তি:

গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ২৩ হাযার ফুট উচ্চতায় দক্ষিণ-পূর্ব ও তারপর পূর্ব দিকে। ভারতের মধ্য দিয়ে প্রায় এক হাযার মাইল অতিক্রম করে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চীন, নেপাল ও ভারতের হিমালয় অঞ্চল থেকে কয়েকটি উপনদী উত্তর দিক থেকে গঙ্গায় পড়েছে। বলা ভাল, গঙ্গার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র চীন, ভারত ও বাংলাদেশ এবং মেঘনা নদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশে স্বাদুপানির যে নদীপ্রবাহ বিদ্যমান, তা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদীপ্রবাহ।

গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে দু' দু'টো চুক্তি হয়েছে। একটি ১৯৭৭ সালে, অপরটি ১৯৯৬ সালে। ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল ভারত ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে এবং ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৪১ দিনের জন্য পর্যায়ক্রমে ১১ হাযার কিউসেক (কিউসেক: প্রতি সেকেন্ড এক ঘনফুট পানি প্রবাহ) থেকে ১৬ হাযার কিউসেক পর্যন্ত পানি প্রত্যাহার করে (সারণি: ১)। শেখ মুজিবের পতনের সাথে সাথে ১৯৭৫ সালে গঙ্গার পানি ভাগাভাগির প্রশ্নে স্বাক্ষরিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায় এবং ভারত গঙ্গা থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নেয়। সারণি: ২ এ ১৯৭৭ ও ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে দুই দেশের জন্য নির্ধারিত পানির হিস্যা তুলনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টত বেরিয়ে আসে। এক. ভারতের অংশ ১-১০ জানুয়ারী সময়কালে স্থিতিশীল রাখা হয়েছে, কিন্তু অন্য আরো ১৪টি ১০ দিন সময়কালে বাড়ানো হয়েছে। অপর পক্ষে বাংলাদেশের অংশ ১-১০ এপ্রিল সময়কালে স্থিতিশীল রাখা হয়েছে, ৭টি ১০ দিন সময়কালে বাড়ানো ও আর ৭টি ১০ দিন সময়কালে কমানো হয়েছে। দুই. আমাদের প্রাপ্তব্য পানির পরিমাণ যে কেবল গাণিতিক অঙ্কে কমবে তাই নয়, তা ১৯৯৬-এর চুক্তি অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের জন্য নির্ধারিত পানির তুলনায়ও হ্রাস পাবে। স্পষ্টতই বছরের সব থেকে শুকনো মৌসুমে অর্থাৎ মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের পানি কমেছে। কিন্তু ভারতের বেড়েছে। এছাড়া সাধারণ অঙ্কেই দেখা যাবে যে ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে বাংলাদেশের ভাগে পানি কমেছে, কিন্তু ভারতের ভাগে তা বেড়েছে। আবার ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে বাংলাদেশ ও ভারতের পানি প্রাপ্তির আনুপাতিক হার ছিল বাংলাদেশের ৬০ শতাংশ এবং ভারতের ৪০ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে তা ছিল যথাক্রমে ৫২ ও ৪৮ শতাংশ। ১৯৭৭ এর চুক্তিতে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন পানি প্রাপ্তির পরিমাণ ৩৪,৫০০ কিউসেক নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে তা কমে এসে হয়েছে ২৭,৬৩৩ কিউসেক। সেটাও এখন পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৭৭ সালের

চুক্তিতে ভারতের সর্বনিম্ন পানি প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল ২০,৫০০ কিউসেক-এ, যা ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে বেড়ে হয়েছে ২৫,৯৯২ কিউসেক। দেখা যাচ্ছে, আমাদের হিস্যা কমেছে কিন্তু ভারতের বেড়েছে। ১৯৯৬-এর চুক্তি অনুযায়ী মার্চ থেকে মে মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ৭টি ১০ দিন সময়কালে বাংলাদেশ ও ভারত পর্যায়ক্রমে, অর্থাৎ একবার আমরা আর একবার ভারত, ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে তা স্পষ্ট। অপরদিকে পানির পরিমাণ ৫০,০০০ কিউসেক-এ নামার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ রয়েছে। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে ১০ দিন সময়কালে ভারতের জন্য ৩৫,০০০ কিউসেক নির্ধারিত রয়েছে, সে সময় যদি প্রবাহ পরিমাণ থাকে ৫০,০০০ কিউসেক, তাহ'লে আমরা পাব মাত্র ১৫,০০০ কিউসেক। এর অর্থ হচ্ছে চুক্তি না থাকাকালীন সময়ে গত কয়েক বছরে ভারত আমাদের যতটুকু পানি দিয়ে আসছে আমরা চুক্তির মাধ্যমে তা চিরকালের জন্য জায়েয করে দিলাম। এতদিন প্রতিবাদ করতে পারতাম এখন আমরা নিজেই নিজেকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করলাম।[২]

১৯৭৭-এর চুক্তিতে সর্বনিম্ন পানি প্রাপ্তির বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে এরূপ গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল যে, যদি পানির পরিমাণ কোন সময়ে কমে যায় তাহ'লেও বাংলাদেশ নির্ধারিত পরিমাণ পানির অন্তত শতকরা ৮০ ভাগ পাবে এবং যদি পরিমাণ বাড়ে তাহ'লে আনুপাতিক হারে উভয় দেশের মধ্যে তা বণ্টিত হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণের শতকরা মোটামুটি ৬০ ভাগ বাংলাদেশ এবং শতকরা ৪০ ভাগ ভারত পাবে (১৯৭৭-এর চুক্তির ২ নং ধারা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ১৯৯৬-এর চুক্তিতে কেবলমাত্র বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ পানি পাওয়ার কোন গ্যারান্টি নেই। অবশ্য এরূপ উল্লেখ আছে যে, (সংযোজনী-১) মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুমে পর্যায়ক্রমে তিন ১০ দিন সময়কালে বাংলাদেশ এবং অপর তিন ১০ দিন সময়কালে ভারত ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে। কিন্তু তাও প্রযোজ্য হবে না যদি পানি ৫০,০০০ কিউসেকের নীচে নেমে আসে। এরূপ ক্ষেত্রে চটজলদি দু'দেশের সরকার আলোচনার মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান করবে। এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অকার্যকর। কারণ সরকারী পর্যায়ে সমাধান হ'তে যে দীর্ঘ সময় লাগবে ততদিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষিতে, যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই যাবে। কোন কোন মহল থেকে বলা হচ্ছে যে, নির্ধারিত পানির ৯০ শতাংশ পাওয়ার গ্যারান্টি চুক্তিতে রয়েছে। এটি আদৌ সঠিক নয়। আদতে শতকরা ৯০ ভাগ পানি পাওয়ার গ্যারান্টি থাকবে তখনই যখন ২ বা ৫ বছর পর চুক্তির সামগ্রিক পর্যালোচনাকালে দু'দেশের মধ্যে ঐকমত্য না হয় তাহ'লে। অর্থাৎ এটি যে কোন সময়, যে কোন ১০ দিন সময়কালের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য নয়, যা ১৯৭৭-এর চুক্তিতে ছিল।[৩]

চুক্তি অনুসারে ৫০,০০০ থেকে ৭০,০০০ কিউসেক পানি থাকলে তা শতকরা ৫০ হারে উভয় দেশের জন্য বণ্টন করা হবে। আবার শুষ্ক মৌসুমের তিনটি ১০ দিনের সময়কালে (২১-৩০ মার্চ, ১১-২০ এপ্রিল ও ১-১০ মে) ভারতের জন্য সর্বনিম্ন প্রবাহ থাকবে ৩৫ হাযার কিউসেক, যা দিতেই হবে। ফারাক্কায় যখন ৫০ হাযার থেকে ৭০ হাযার কিউসেক পানি থাকবে, তখন ভারতের জন্য বরাদ্দ ৩৫ হাযার কিউসেক দিলে আমরা কতটুকু পাব, তা খুব সহজেই হিসাব করে বের করা যায়। ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আরো কেটে গেছে ১১ বছর। কিন্তু আমরা কী পেয়েছি? ২০০৬ কিংবা ২০০৭ সালে বাংলাদেশ কী পরিমাণ পানি পেয়েছে, তার হিসাব না হয় বাদই দিলাম। ২০০৮ সালের পানির হিস্যার যদি পরিসংখ্যান দেই, তা কোন আশার কথা বলে না। যৌথ নদী কমিশন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে ভারত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম কিস্তিতে ১ হাযার ২১০ কিউসেক পানি কম দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রাপ্ত হচ্ছে ৪৬ হাযার ৩২৩ কিউসেক। কিন্তু ভারত দিয়েছে ৪৫ হাযার ১১৩ কিউসেক। ভারত তার নিজের হিস্যা ৪০ হাযার কিউসেক ঠিকই বুঝে নিয়েছে। এর আগে জানুয়ারীতে তিন কিস্তিতে ফারাক্কার প্রায় ৩৬ হাযার ৮৬২ কিউসেক পানি কম দিয়েছে ভারত।[৪] গঙ্গার পানি চুক্তি কার্যত এখন অকার্যকর। চুক্তি করে বাংলাদেশ কখনই লাভবান হয়নি এবং আগামীতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প:

গঙ্গার তথাকথিত পানি চুক্তি যখন বাংলাদেশকে তার পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, ঠিক তখনই ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্প খোদ ভারতেই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই বিশাল নদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে ৩৭টি নদীকে ৯ হাযার কিলোমিটার দীর্ঘ ৩১টি খালের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করে ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করার জন্য। প্রকল্পটির মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে যাওয়া হবে গঙ্গায়। সেখান থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে মহানন্দা এবং গোদাবরিতে। গোদাবরির পানি নিয়ে যাওয়া হবে কৃষ্ণায় এবং সেখান থেকে পেনার এবং কাবেরীতে। নর্মদার পানি নিয়ে যাওয়া হবে সবরমতিতে। এই বিশাল আন্তঃঅববাহিকা পানি প্রত্যাহার প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হবে ২০১৬ সালের মধ্যে। ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট একটি অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকারকে এ প্রকল্প একটি

---

২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত 'গঙ্গার পানি চুক্তি: প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা', ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ৬০-৭২।

৩. ঐ।

৪. নয়াদিগন্ত, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরামর্শ প্রদান করেছে (আগে নির্ধারিত ৪৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছরের মধ্যে)। কিন্তু ভারতের সর্বোচ্চ আদালত এই সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে যে, গঙ্গা-কাবেরী সংযোগ প্রকল্প কোন নতুন ধারণা নয়। এ প্রকল্প কৌশলগতভাবে অগ্রহণযোগ্য ও অবাস্তব হওয়ায় আগেই বেশ কয়েকবার পরিত্যক্ত হয়েছিল। এ কাজের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে, ভারত সরকারের এই প্রকল্প তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর জন্য কি ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। একই সাথে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত সমস্ত রীতিনীতির প্রতি নিদারুণ উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় যেসব নদীর সংযোগ ঘটবে, তা অনেকটা এ রকম- (১) ব্রহ্মপুত্রের উপনদী মানোস-সংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা সংযোগ, (২) কোশী-ঘাগরা সংযোগ, (৩) গন্ডক-গঙ্গা সংযোগ, (৪) ঘাদরা-যমুনা সংযোগ, (৫) সারদা-যমুনা সংযোগ, (৬) যমুনা-রাজস্থান সংযোগ, (৭) রাজস্থান-সাবরমতী সংযোগ, (৮) চুনার-শোন ব্যারেজ সংযোগ, (৯) শোন ব্যারেজ ও গঙ্গার দক্ষিণের শাখাগুলোর মধ্যে সংযোগ, (১০) গঙ্গা-দামোদর-সুবর্ণ রেখা সংযোগ, (১১) সুবর্ণ রেখা-মহান্দী সংযোগ, (১২) কোশি-মেচী সংযোগ, (১৩) ফারাক্কা সুন্দরবন সংযোগ এবং (১৪) ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ, (১৫) মাহান্দী (মনিভ্রদ্র)-গোদাবরী (ধলেশ্বর) সংযোগ, (১৬) গোদাবরী (ইনচম পল্লী)-নার্গাজুন সাগর সংযোগ, (১৭) গোদাবারী (পোলাভারাম)-বিজয়ওয়ালা সংযোগ, (১৮) কৃষ্ণা-(আলামাত্তি) পেন্নার সংযোগ, (১৯) কৃষ্ণা (শ্রীসইলাম)-পেন্নার সংযোগ, (২০) কৃষ্ণা (নার্গাজুন সাগর)-সোমশিলা সংযোগ, (২১) পেন্না (সোমশিলা)-কাবেরী (গ্রান্ড অ্যানিকুট) সংযোগ, (২২) কাবেরী (কত্তালাইয়া)-ভাইগাই-গুন্ডুর সংযোগ, (২৩) কেন-বেতওয়া সংযোগ, (২৪) পার্বতী-কালী সিন্ধু-চম্বল সংযোগ, (২৫) পার-তাপ্তী-নর্মদা সংযোগ, (২৬) দামন গঙ্গা পিঞ্জল সংযোগ, (২৭) বেদাতি-ভার্গা সংযোগ, (২৮) নেত্রাবতী-হেমবতী সংযোগ এবং (২৯) পম্বা-আচান কোভেলী-ভাইপ্পার সংযোগ।

এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হ'লে বাংলাদেশর উপর মারাত্মক আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থায় ভয়াবহ প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হ'তে পারে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশের যেসব ক্ষতি হ'তে পারে তা নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: (১) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বর্তমানে পাওয়া প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন ধরে পাওনা পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে। (২) বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে তার মিঠা পানির মোট ৮৫ শতাংশই ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা নদী থেকে পায়। এককভাবে ব্রহ্মপুত্র থেকেই পাওয়া যায় মোট প্রয়োজনের ৬৫ শতাংশ পানি। সুতরাং ভারতের পরিকল্পনামত পানি প্রত্যাহার করা হ'লে তা আমাদের দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। (৩) ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নেতিবাচক প্রক্রিয়া হবে। ভূ-উপরিস্থ পানি কমে গেলে ভূ-গর্ভস্থ পানি বেশী পরিমাণে উত্তোলন করা হবে এবং এতে আর্সেনিক সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। (৪) মিঠা পানির মাছের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং জলপথে পরিবহন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৫) পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন কৃষি প্রকল্প হাতে নিতে পারবে না। পানির অভাবে কৃষি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৬) পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আরও আশংকা করছেন দূষিত নদীগুলোর পানি অপেক্ষাকৃত দূষণমুক্ত অন্য নদীগুলোর পানিকে দূষিত করে তুলবে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণের শিকার নদীগুলোর পানি অন্য নদীগুলোতে মেশালে এ অঞ্চলের পরিবেশ রক্ষা আরও কঠিন হয়ে পড়বে, যা এ অঞ্চলের মানুষ ও বণ্যপ্রাণীর জীবন বিপন্ন করে তুলবে। (৭) এসবের চেয়েও মারাত্মক বিষয় হচ্ছে প্রকল্পে নির্মিতব্য বড় বড় বাঁধ গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

এছাড়া এ প্রকেল্পর দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়ায় আমাদের পরিবেশগত ও জলপ্রবাহ বিষয়ক প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। পানি এবং মাটির অধিক লবণাক্ততা আমাদের দেশকে ধীরে ধীরে একটি মরুভূমিতে পরিণত করবে। নদী মানে শুধু পানি নয়, নদীর মধ্যে এবং একেই কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা জীবগুলোর জন্য এখানে আছে এক অসাধারণ জীববৈচিত্র্য। অথচ এই জীববৈচিত্রই নয়, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে ভারত তার আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।[৫] ভারত এই পরিকল্পনা নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও বারবার বলা হচ্ছে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পটি ধারণাগত পর্যায়ে রয়েছে। এটি সত্য নয়। ভারত এই প্রকল্পের ব্যাপারে সিরিয়াস। তারা ধীরে ধীরে প্রকল্পটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

টিপাইমুখ বাঁধ:

বাংলাদেশের জন্য আরেকটি দুঃখজনক খবর হচ্ছে টিপাইমুখ বাঁধ। বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় ধরনের আতঙ্ক। ভারতের টিপাইমুখ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টে যে হাই ড্যাম নির্মাণ করা হবে তার উচ্চতা ১৬২ দশমিক ৮ মিটার। এর পানি ধারণ ক্ষমতা ১৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০ মেগাওয়াট। এটি নির্মিত হবে প্রায়

৫. মোহাম্মদ মনিরুল আজম ও মোহাম্মদ সাইফুল করিম, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প; আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ ও পরিবেশ আইনের লজ্ঞন, যুগান্তর, ২৮ জুলাই ২০০৪।

বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে, আসামের করিমগঞ্জে বরাক নদীর উপর। এ বরাক নদী হচ্ছে সুরমা ও কুশিয়ারার মূল ধারা। সুরমা ও কুশিয়ারা পরে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে আমাদের বিশাল মেঘনা। বরাক নদী প্রায় পাহাড় থেকে নেমেই সুরমা ও কুশিয়ারায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ফলে এর স্রোতের গতি, বালু বহনের পরিমাণ পদ্মা নদীর চেয়ে অনেক বেশী। অন্যদিকে টিপাইমুখ হাই ড্যামের অবস্থান বাংলাদেশের সীমানার খুবই কাছে। ফলে এর থেকে সৃষ্ট সব ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব যেমন- নদীগর্ভে অতিরিক্ত বালুর সঞ্চালন ও সঞ্চয়ন, হঠাৎ বন্যা, অতিবন্যা ইত্যাদির প্রভাব সম্পূর্ণটুকুই পড়বে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে সম্পূর্ণ হাওর জনপদের উপর। এ অঞ্চলের সার্বিক দৃশ্যপট অতি দ্রুত পাল্টে যাবে। আনুমানিক ১০-১৫ বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের হাওর, বিল-ঝিল, বাঁওড়, নদী-নালা বালুতে প্রায় ভরে যাবে। হাওর অঞ্চলের অত্যন্ত উর্বরা ধানের জমি পুরু বালির স্তরের নীচে চাপা পড়বে। ধ্বংস হয়ে যাবে কৃষি। হারিয়ে যাবে শস্য তথা বোরো, শাইল ও আমন ধানের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। ধ্বংস হয়ে যাবে জীববৈচিত্র। হারিয়ে যাবে এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মাছ, গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ ও লতাগুল্ম। ধ্বংস হয়ে যাবে মহামূল্যবান মৎস্য সূতিকাগার। সুরমা ও কুশিয়ারা ধ্বংস হ'লে মেঘনার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সুতরাং শুধু সিলেট বা সিলেটের হাওর অঞ্চলই নয়, মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে মেঘনা নদী অধ্যুষিত জনপদে বসবাসরত এ দেশের প্রায় অর্ধেক জনগণ। ধস নামবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, দেশের অর্থনীতিতে।

এ টিপাইমুখ ড্যাম প্রস্তাবনা থেকে বর্তমান পর্যায়ে আসতে সময় লেগেছে প্রায় ৬০ বছর। এ ড্যামের প্রস্তাবনা নেয়া হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। ২০০৫ সালের ২৩ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে তার উদ্বেগ ভারত সরকারকে জানিয়েছে। তবে এ সম্পর্কে ভারত কোন রকম প্রতিক্রিয়া জানায়নি বা কোন আলোচনার প্রস্তাব দেয়নি। গত জানুয়ারীতে (২০০৬) টিপাইমুখ বাঁধ এর ভয়াবহতাকে সামনে রেখে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। 'বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন' (বাপা) এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে জানানো হয়, ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতে ২২৬টি বড় বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করেছে, যার লক্ষ্য হবে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে প্রায় ৯৯ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। ২০১২ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার' অংশ হিসাবে ৫০ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের নদীগুলোর উপর ১৬টি বৃহৎ বাঁধ চালু করেছে এবং ৮টি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি ভারত আরো ৬৪টি বড় বাঁধ নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ তথ্যটি দেন যুক্তরাষ্ট্রের লক হ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ মুহাম্মাদ খালেকুযযামান। তার মতে, এ বাঁধ নির্মাণের ফলে উজানে ও ভাটিতে সার্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্রগুলো ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।[৬]

ঢাকায় 'আন্তর্জাতিক টিপাইমুখ বাঁধ সম্মেলনে' একটি 'ঢাকা ঘোষণা' এবং কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঢাকা ঘোষণায় ভারত সরকারকে অবিলম্বে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বাতিল করার জন্য সর্বসম্মতভাবে দাবী জানানো হয়। সভায় বক্তারা সার্ক দেশগুলো এবং চীন ও মায়ানমারকে নিয়ে এ অঞ্চলে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন। এরা সার্ক সনদে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টি সংযুক্ত করার দাবী জানান। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পরিবেশবাদীরা আরো বলেছেন, এ এলাকার নদীগুলো, তাদের উপকারিতা ও অপকারিতার উপর নির্ভরশীল ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উপর নদীগুলোর সার্বিক প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা এবং তথ্যবিন্যাস নিশ্চিত করতে হবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতেই বিদ্যমান সব নদীচুক্তির মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ সমন্বিত পরিকল্পনা নেয়ার উপর তারা জোর দেন। ইতিমধ্যে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করায় মরে যাচ্ছে প্রমত্তা সুরমা। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের সুরমা নদীর পানি প্রবাহ গত ১০ বছরে শতকরা ৮০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, ভারতের বরাক নদী বাংলাদেশের সুরমা, কুশিয়ারা অমলশীদে এসে মিলিত হয়েছে। বরাক, সুরমা ও কুশিয়ারা এ তিন নদীর মিলনস্থল অমলশীদ এক সময় অনেক গভীর ছিল। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমান অনুযায়ী, বর্তমান শুষ্ক মৌসুমে বরাক নদী থেকে প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ৮৩ দশমিক ৫৯ ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ পাঁচ বছর আগে এ প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৩০০ ঘনমিটার। পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্ষা মৌসুমে ভাঙ্গন রোধে বরাক নদীর দুই তীরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাঠামো নির্মাণের ফলে ধীরে ধীরে সুরমা নদীর প্রধান প্রবাহ কুশিয়ারার দিকে ঘুরে গেছে। এতে বলা হয়, সুরমার ভাটিতে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার মরে গেছে।[৭]

[চলবে]

---

৬. *আমার দেশ, ৩ জানুয়ারী ২০০৬।*
৭. *যুগান্তর, ১৫ জানুয়ারী ২০০৬।*

Contents

পরিবেশ ও জীবনঃ অনুকূল জলবায়ু রক্ষায় বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব

*এস.এম. শফীউযযামান**

পরিবেশ বর্তমান বিশ্বে আলোচিত একটি বিষয়। জীবনের সাথে এর অপরিহার্য সম্পর্কের জন্যই বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ। আজ হ'তে ৫০ বছর আগেও পরিবেশ বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে এতটা আলোচনার বিষয় ছিল না। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি দেশে পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে সর্বক্ষেত্রে বিবেচিত। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, বর্তমান পৃথিবীর আবহাওয়া বা জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন, যেটা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেও ছিল স্থিতিশীল। এই পরিবর্তিত আবহাওয়া তথা দূষিত পরিবেশ আজ জীবকুলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন বদলে যাচ্ছে বিশ্বজলবায়ু, বিশ্বপরিবেশ?

অনুকূল জলবায়ু রক্ষায় বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব জানতে হ'লে আবহওয়া পরিবর্তনে এর ভূমিকা জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পরিবেশ এবং পরিবেশতন্ত্র (Ecosystem) সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। আমাদের চারপাশে যে সমস্ত সজীব ও নির্জীব উপাদান আছে তাদের সমন্বয়ে পরিবেশ গঠিত। উদ্ভিদকুল (Flora) ও প্রাণীকুল (Fauna) নিয়ে গঠিত সজীব উপাদান এবং মাটি, পানি, বায়ু, উত্তাপ ও আলো নিয়ে গঠিত নির্জীব উপাদান। পরিবেশে এই সকল সজীব ও নির্জীব উপাদানগুলির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও নির্ভরশীলতা নিয়ে গঠিত জটিল পরিবেশতন্ত্র (Ecosystem)। পরিবেশের এই সব উপাদানগুলোর মধ্যে যখন ভারসাম্য বজায় থাকে তখন তৈরী হয় সুষম বা আদর্শ পরিবেশ, যেখানে প্রাণীকুল বিশেষ করে মানব সম্প্রদায় সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে। পরিবেশতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদান জীবকুল বিশেষ করে মানব জাতির জন্য অপরিহার্য। অথচ এই মানব জাতিই হাতে তুলে নিয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত করার যাবতীয় হাতিয়ার। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরাজি তথা বনাঞ্চল মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যাদেরকে পরিবেশতন্ত্রে উৎপন্নকারী (Producer) এবং প্রাণীকুলকে খাদক বা ভক্ষক (Consumer) বলা হয়ে থাকে। মানব সম্প্রদায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদৌলতে পরিবেশের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং পরিবেশতন্ত্রে বড় ভক্ষক হিসাবে বিবেচিত। উদ্ভিদকুল উৎপন্নকারী উপাদান রূপে পৃথিবীর জলবায়ু তথা পরিবেশ সুষম রেখে ভক্ষকদের সুবিধার জন্য কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

বর্তমান বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন তথা বিশ্বপরিবেশ ভারসাম্যহীনতার একটি অন্যতম কারণ অধিক হারে বৃক্ষ নিধন ও বন বিনাশ। ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘর-বাড়ী, আসবাবপত্র, যানবাহন তৈরী এবং জ্বালানী রূপে বনজ সম্পদের ব্যবহার ছাড়াও বহুবিধ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ বনাঞ্চল ও তৃণভূমি ব্যাপক হারে নিধন করছে। যার ফলে পরিবেশতন্ত্রে উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি সহ বিশ্ব আবহাওয়ায় বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার অশুভ ও প্রতিকূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও বিশ্বে প্রায় ৬ হাযার কোটি হেক্টর জমিতে বনভূমি ছিল। এখন তা নেমে এসেছে প্রায় ৩৬০ কোটি হেক্টরে। স্বনামখ্যাত পরিবেশ সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড কমিশন অন ফরেষ্ট এন্ড সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট'-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিগত ২০ বছরে ২৫টি দেশের বনভূমি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং আরো ১৮টি দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ বনভূমির বিনাশ ঘটেছে। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক পরিবেশ সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন'-এর এক তথ্য অনুযায়ী, এ হারে বন ধ্বংসের ফলে বিশ্বের ২ লক্ষ ৭০ হাযার বৃক্ষ প্রজাতির অন্ততঃ ১২.৫ শতাংশ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রজাতির ৭৫ শতাংশ বিলুপ্তির জন্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। পৃথিবীর মোট ভূমির ৩০ ভাগ জায়গা দখল করে আছে এই বনাঞ্চল, যা বায়ুমণ্ডলে উপাদান, আবহাওয়া এবং পুষ্টি চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী বায়ু বিশুদ্ধকরণ সহ পরিবেশতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা ও দেশের চাহিদা পূরণের জন্য কোন দেশে তার মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই পরিমাণ বনভূমি আছে। বাংলাদেশে এর পরিমাণ মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগের মত। আফ্রিকার যে বিশাল বনভূমি বিশ্বের পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখছিল দীর্ঘ দিন ধরে, তাও আজ হুমকির সম্মুখীন। জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, একমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সহিংসতার মাধ্যমে বৃক্ষ নিধনের ফলে বদলে যাচ্ছে আফ্রিকার জলবায়ু এবং নেমে আসছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পশ্চিমা ও ইউরোপের দেশগুলো শিল্পায়ন, সভ্যতার বিকাশ ও তথাকথিত একমুখী উন্নয়নের নামে নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করে প্রচুর পরিমানে CO_2 বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ করে তার দায় চাপিয়ে দিচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোর উপর। যার ফলে লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জন্য একমাত্র বাসস্থান আমাদের এ পৃথিবী হারাতে বসেছে তার ঐতিহ্য।

প্রকৃতিতে যে কোন পরিবর্তন সাধারণত মন্থর ও ক্রমান্বয়িক হ'লেও মানুষের নির্বিচার বনরাজি ধ্বংসের ফলে এই পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত এবং পরিবেশ হয়ে পড়ছে ভারসাম্যহীন। পরিবেশের এই ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য অর্থাৎ অনুকূল জলবায়ু সংরক্ষণে বৃক্ষরাজি তথা বনাঞ্চল প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন- বৃক্ষ

* *প্রভাষক, পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

বায়ুমণ্ডলে আমাদের ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা নির্গত বর্ধিত CO_2 সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং জীবের জন্য অত্যাবশ্যকীয় O_2 ত্যাগ করে বায়ুমণ্ডলে O_2 এবং CO_2 এর অনুপাত ঠিক রেখে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রীষ্মকালের উচ্চ তাপমাত্রা পরিমিতকরণ এবং বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে বৃক্ষরাজি ও তৃণভূমি বিশেষভাবে অবদান রাখছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বনভূমিহীন এলাকার তুলনায় বনভূমি আবৃত এলাকায় তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রায় ১১% অধিক। এছাড়াও কোন অঞ্চলের ভূমির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, শুষ্ক মৌসুমে প্রচণ্ড ক্ষরা রোধ বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, ভূমি ক্ষয় রোধ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর হ্রাস রোধে বৃক্ষরাজি তথা বনাঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্ব পানিচক্রের ভারসাম্য রক্ষাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিধস ইত্যাদি থেকে জনজীবন ও সম্পদ রক্ষায় বন সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

অপর্যাপ্ত বৃক্ষরাজি বা বনাঞ্চল পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যেমন- মাটি ও বায়ুমণ্ডলের ক্রমবর্ধমান শুষ্কতা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিম্নগমন, শীত ও গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূমি ক্ষয়ের ফলে নদ-নদী ভরাট হয়ে বর্ষাকালে বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস বা বিলুপ্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে এবং অবশিষ্ট বৃক্ষরাজি এই পরিবর্তিত পরিবেশতন্ত্রে আরো বেশী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। ব্যাপক শিল্পায়নের সাথে সাথে বৃক্ষ নিধন এবং সেই হারে বনায়নের অভাবে CO_2 মাত্রাতিরিক্তভাবে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে দ্রুত বিশ্ব জলবায়ু বদলে দিচ্ছে। যার ফলে দুই মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের পানির তল বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর অনেক দ্বীপমালা, উপকূলীয় দেশ ও শহর, সাগর-মহাসাগরের বুকে তলিয়ে মুছে যাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে, এই আশংকা দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে।

সুতরাং বিশ্বপরিবেশ পরিবর্তন জীবনের জন্য যাতে হুমকি না হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ বা অনুকূল জলবায়ু রক্ষায় বৃক্ষ রোপণ বা বনায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের প্রেক্ষিতে সুষম পরিবেশে সুখি ও সমৃদ্ধশালী রূপে টিকে থাকতে হ'লে একদিকে যেমন সংযমী মনোভাব নিয়ে অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধন বা বনাঞ্চল না কেটে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, অন্যদিকে বন সম্প্রসারণ সহ গৃহপালিত পশুদের জন্য চারণভূমি গড়ে তোলা এবং বাস্তব কর্মপন্থারূপে একটি বৃক্ষ কাটার আগে কমপক্ষে দু'টি বৃক্ষের চারা রোপণ ও তাদের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নেওয়া আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাহ'লেই হয়তো সম্ভব হবে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা।

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতেরও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তিঃ

মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১- ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২- ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...। এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপঃ ১- সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ-

অর্থঃ (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ-

অর্থঃ 'উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ..

'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে এবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'এখলাছ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপঃ

১- আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ- 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২- মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ'

বলেছেন। প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩- ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাত:

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিস্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লাআলী' কিতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেককার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আতবদ্ধ ভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমন:

এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনকাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাত্রে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে-

تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ–

'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয়:

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

Contents

খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি: কারণ ও প্রতিকার

*নূরুল ইসলাম**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে রকেটের গতিতে ও হারিকেনের তীব্রতায় বাধভাঙ্গা জোয়ারের মতো। দ্রব্যমূল্যের অস্থির পাগলা ঘোড়াটিকে যেন কোনক্রমেই বশীভূত করা যাচ্ছে না। পণ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্যের আঁচড় সকল পেশা-শ্রেণীর মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করছে প্রতিনিয়ত। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে রীতিমত হাঁস-ফাঁস করছে। পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে বাড়ীর কর্তাদের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। নিম্নবিত্ত ও সীমিত আয়ের মানুষের দিন যেন আর চলে না। চলমান খাদ্য সংকটের কারণে দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ অপুষ্টির ঝুঁকিতে রয়েছে। নীরব দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে শহর-নগর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্রই। বাড়ছে দেশে দারিদ্রের হার। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে দিনে এক ডলার বা ৬৯ টাকার নীচে আয় করে বাংলাদেশে এমন মানুষের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বা ৬ কোটি। বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সমুন্নয়'-এর তথ্য মতে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রায় ১২ লাখ ৪৩ হাযার পরিবার বা ৬২ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাথাগুনতি দারিদ্র্য ৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৪৫ দশমিক ৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশক সমূহ' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী গত এক বছরের ব্যবধানে পল্লী অঞ্চলের দারিদ্রের ঊর্ধ্বসীমার হার ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩ দশমিক ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ বৃদ্ধির হার ৪৭ শতাংশ। 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (বিআইডিএস)-এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ পরিবারই বছরে কোন না কোন সময় খাদ্য সংকটে থাকে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ পরিবার নিয়মিতভাবেই সারা বছর খাদ্য সংকটে থাকে। ১৫ শতাংশ পরিবার সর্বদা চিন্তিত থাকে পরের বেলার খাবার নিয়ে এবং ৭ শতাংশ কখনোই তিন বেলা খেতে পায় না।

গত ২৬ এপ্রিল 'অর্থনৈতিক অবস্থা ও দ্রব্যমূল্য' শীর্ষক সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেছেন, গত এক বছরে নতুন করে শতকরা ২০ ভাগ লোক দরিদ্রদের কাতারে যোগ দিয়েছে। গত দেড় বছরে বেকার হয়েছে ১ কোটি মানুষ। একই সময়ে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ কোটিতে। ৪ কোটি লোক বর্তমানে কোনদিনই ৩ বেলা খাবার পায় না। ঐ সেমিনারে অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাত বলেন, গত দেড় বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়েছে ৩০-৩০০ ভাগ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত 'ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিস্টিকস' রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশের খানা বা পরিবারগুলো মৌলিক খাবার ও পানীয় কিনতে খরচ করেছে ২,১২,১২৫/= কোটি টাকা। যা আগের অর্থবছরে ছিল ১,৮১,৬৫২/= কোটি টাকা। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩০ হাযার ৪৭৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। গত অর্থবছরে (২০০৭-০৮) খাবার ও পানীয় বাবদ খরচ বৃদ্ধির হার ছিল ১৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ হার ছিল ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ। সূত্র মতে, খাবারের দাম বাড়ায় গত অর্থবছরে দেশের মানুষের প্রতিদিন অতিরিক্ত খরচ হয়েছে সাড়ে ৮৪ কোটি টাকা। খাবার ও পানীয় যোগাতে গত দুই বছরে খরচ বেড়েছে প্রায় ৩৪ ভাগেরও বেশী।

'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি)-এর হিসাব মতে ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৮ সালের মার্চ সময়ে দরিদ্র মানুষের আয় কমেছে ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এই মানুষগুলো তাদের মোট আয়ের ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশই ব্যয় করে চাল কিনতে। গত মার্চ পর্যন্ত চালের দাম বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ। এই হিসাবে শুধু চাল কেনার জন্যই প্রকৃত আয় কমেছে ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ। বাকী ৬ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার কারণে। সিপিডির হিসাব মতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ২৫ লাখ পরিবার নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে। বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষের হার ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সালে দেশের ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত। ১৯৯৯ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীর হার দাঁড়ায় ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ২০০০ সালে ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০০৪ সালে এ হার ৪২ দশমিক ১ শতাংশে নেমে আসে এবং ২০০৫ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ শতাংশে।[৮]

** এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৮. *State of the Bangladesh Economy in 2004-05 and Outlook for 2005-2006, Published by CPD in 2006. P. 14; Country Strategy and Program 2006-2010 Bangladesh, Published by ADB in 2005, p. 4.*

গত ৪ জুন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় 'বাংলাদেশ: পভার্টি রেট রাইজ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, 'গত ৩ বছরে চালের দাম দ্বিগুণ হওয়ায় বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আবার বেড়েছে। এর আগে কয়েক বছর ধরেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা সন্তোষজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছিল'। বিশ্লেষকদের মতে বর্তমানে প্রতি দু'জন দেশবাসীর মধ্যে একজন দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং প্রতি চারজনে একজন একেবারে হতদরিদ্র- নিঃস্ব-রিক্তহস্ত। 'কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব)-এর তথ্য মতে, ২০০5 সালে দ্রব্যমূল্য বেড়েছিল ৬ দশমিক ৩২ ভাগ, ২০০৬ সালে বেড়েছিল ১৫ দশমিক ২২ ভাগ। আর ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুধু অক্টোবর পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৮.১৩ ভাগ, যা ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকালীন সময়ের চেয়ে ৮.১৩ ভাগ বেশী। ৭৪ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। ক্যাব-এর সাম্প্রতিক তথ্য মতে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে গড়ে পণ্যমূল্য বেড়েছে ১৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে শুধু চাল, ডাল, আটা, ময়দা, ভোজ্যতেল এবং দুগ্ধজাত পণ্যের দামই বেড়েছে সাড়ে ৪৫ শতাংশ।

দ্রব্যমূল্যের এই অসহনীয় অবস্থার কারণে 'মাছে-ভাতে বাঙ্গালী' আর 'প্রাচুর্যের উপচেপড়া নহর' খ্যাত এ দেশের জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। দ্রব্যমূল্যের ঝঞ্ঝাবায়ুর তোড়ে নাকাল হচ্ছে জনগণ। অভাবের তাড়নায় বগুড়া সদর উপযেলার লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়নের দোবাড়িয়া গ্রামের রিকশাচালক নূরুল ইসলামের স্ত্রী মমতাজ বেগম (২৫) তার ৪ বছরের শিশু কন্যা পাখি খাতুনকে বিষপান করিয়ে হত্যার পর নিজে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে, টাঙ্গাইলের মধুপুরের রেণু বেগম নিজের নয়নের মণি মাত্র ১ বছরের কোলের শিশুকে ১০ হাযার টাকায় বিক্রি করেছে, একই এলাকার কমল বর্মণ এনজিওর ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আত্মহত্যা করেছে, রাজশাহীর পুঠিয়ার দিনমজুর বাবলু তার দুই শিশু কন্যাকে হত্যার পর নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, নওগাঁর মহাদেবপুরের স্কুলছাত্রী সাথী গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে এবং চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ের দিনমজুর আযীযুল হক জাহেলী যুগের ন্যায় তিন সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা করেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। অভাবের কারণে এবার ৬ লাখ ৬ হাযার ২০৬ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারেনি। সংগতকারণেই দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসে খাদ্য নিরাপত্তা* গড়ে তোলা সময়ের অনিবার্য দাবী হয়ে উঠেছে। তবে তার আগে জানা দরকার কেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঘটে। তাই নিম্নে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ ও প্রতিকার সহ খাদ্য সংকট মোকাবিলার উপায় আলোচনা করা হ'ল-

(১) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির অন্যতম কারণ হচ্ছে মজুদদারী। একশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী মুনাফাখোর ব্যবসায়ী সস্তা দামে পণ্য ক্রয় করে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য পণ্য মজুদ করে রাখে। ফলে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে জনগণের নাগালের বাইরে চলে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বোরোর বাম্পার ফলন ও প্রচুর আলু উৎপাদন হওয়ার পরও এই মজুদদার সিন্ডিকেটের কারণে চাল ও আলুর দাম কমছে না; বরং বাড়ছে। তাই দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুদ করে মূল্য বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে গোয়েন্দা সংস্থা ও জনগণের সহযোগিতায় শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে কেউ পরবর্তীতে এ ধরনের অপকর্ম করার দুঃসাহস না দেখায়। ওমর ও আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মজুদদারদের কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা দিলে তারা প্রথমত মজুদদারদেরকে নছীহত করতেন এবং নছীহত না শুনলে কঠিন শাস্তি দিতেন।[৯] ইসলামে মজুদদারীকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে, مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ 'যে পণ্য মজুদ করে সে পাপী'।[১০] শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, والمعنى: لايجترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية. 'হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে- যে পাপ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কেবল সেই এই জঘন্য কাজ করতে দুঃসাহস দেখাতে পারে'।[১১]

মজুদদারদের কারণে যদি পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তাহ'লে সরকার কর্তৃক পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রসিদ্ধ ফিক্বহ গ্রন্থ 'আল-হেদায়া'তে বলা হয়েছে,

ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس، فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا, وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة.

** প্রতিটি মানুষের জন্য তিন বেলা খাবার নিশ্চয়তা বিধান করাই হ'ল খাদ্য নিরাপত্তা। ১৯৯১ সালে Life Science Research Organization খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছে, Food Security may be defined as "sustained access at all times, in socially acceptable ways, to food adequate in quantity and quality to maintain a healthy life. 'সুস্থ জীবন যাপনের জন্য সমাজসিদ্ধ তথা বৈধ উপায়ে মানসম্মত ও পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান সর্বদা নিশ্চিত করাকে খাদ্য নিরাপত্তা বলে' (দ্রঃ সংগ্রাম, ৪ মে '০৮, পৃঃ ৯)।*

৯. *ডঃ আমীন মুছত্বফা আব্দুল্লাহ, উসূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী (মিসর: মাতবা'আ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৮৪), পৃঃ ২৮৮-৮৯।*

১০. *মুসলিম (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২২৭।*

১১. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪১, হা/১৭৮১-এর টীকা দ্রঃ।*

'জনগণের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা সরকারের উচিত নয়। তবে খাদ্যের মালিকরা যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং দামের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সীমালংঘন করে আর বিচারক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ছাড়া মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ করতে অপারগ হন, তখন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করাতে কোন দোষ নেই'।[১২]

শুধু মূল্য নির্ধারণই নয়; বরং মজুদদারদেরকে তাদের পণ্য বাজারের প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করতে হবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لايحتاج إليه والناس فى مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل.

'মানুষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সরকার মানুষের কাছে মজুদকৃত পণ্য বাজারের প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন। যেমন- যদি কারো কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য মজুদ থাকে, কিন্তু সে উহার প্রয়োজনবোধ করছে না আর এমতাবস্থায় মানুষেরা ক্ষুধার্ত থাকে, তাহ'লে জনস্বার্থে তাকে তা প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।[১৩]

আব্বাসীয় যুগের জনৈক খলীফার কাছে লোকেরা মজুদদারদের কারণে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ করলে তিনি বাজারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলে সেখানে স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেন এবং ব্যবসায়ীদেরকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করেন।[১৪]

(২) সূদের ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সূদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সূদ যোগ করে দেয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বা তার চেয়েও বেশী সূদ যুক্ত হয়ে থাকে। আর দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয় সাধারণ মানুষ। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সূদের জন্য সৃষ্ট এই চড়ামূল্য দিতে হয়। সূদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সুতরাং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধের জন্য সূদভিত্তিক অর্থনীতির বলয় থেকে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে এসে দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে।

১২. *বুরহানুদ্দীন আল-মুরগীনানী, আল-হেদায়া (দেওবন্দ: মাকতাবায়ে থানবী, ১৪০০ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১-৭২।*
১৩. *ইমাম ইবনু তাইমিয়া, আল-হিসবাহ (কুয়েত: জামঈয়্যাতু ইহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৯৯৬), পৃঃ ১৯।*
১৪. *আল-ফুরক্বান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।*

কারণ সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্বমানবতার জন্য কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। প্রখ্যাত দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল (Bertrand Russell) তাঁর "Unarmed Victory" গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "I dislike communism because it is undemocratic, and capitalism because it favours exploitation". 'আমি সমাজতন্ত্রকে অপসন্দ করি কারণ তা অগণতান্ত্রিক। আর পুঁজিবাদকেও, কারণ তা শোষণের হাতিয়ার'। এজন্য বিশ্ববাসী এখন উন্মুখ একটি ইনছাফপূর্ণ ও জনহিতৈষী অর্থনীতির। জ্যাকসন ডেভিস (Jackson Davis) তার "The Seventh year: Industrial Civilization in Transition" গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন, "The new economics must arise around the theme that small is beautiful, setting its goal the ethical distribution of increasingly scarce resources in accord with basic human needs". 'নতুন অর্থনীতি মৌলিক মানবিক চাহিদার নিরিখে সীমিত সম্পদের নৈতিক বণ্টন ও স্বল্পে তুষ্টির চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে'। ইসলামী অর্থনীতিই এ চাহিদা পূরণ করতে পারে।

তাছাড়া কৃষক ও উৎপাদকদেরকে সূদমুক্ত ঋণ প্রদান করতে হবে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ পাবার ক্ষেত্রে তারা যেন কোন প্রকার হয়রানির শিকার না হন সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) উৎপাদন হ্রাস ও আমদানির অপ্রতুলতার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এথেকে উত্তরণের জন্য (ক) প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন (খ) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ জোরদার ও মজুদ থেকে বাজারে সরবরাহ (গ) আমদানির মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ এবং (ঘ) দেশে যেসব পণ্যের সংকট রয়েছে সেগুলো রফতানী নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৪) দুর্নীতিবাজ লোকদের কালো টাকার দৌরাত্ম্যের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তারা ৩০ টাকার জিনিস ৫০ টাকায় কিনতেও দ্বিধা করে না। সেজন্য সমাজদেহ বিধ্বংসী ক্যান্সার 'দুর্নীতি'র মূলোৎপাটন করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক, আম জনতা, দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, আলেম-ওলামা, বক্তা, খতীব, গবেষক, সাংবাদিক সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। গত ২৮ জুলাই ২০০৭-এ এক সেমিনারে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, 'দুর্নীতিকে সামাজিকভাবে এবং দুর্নীতিবাজকে সমষ্টি ও ব্যক্তিগতভাবে বর্জন করা না গেলে দুর্নীতিকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা কঠিন হবে এবং ভবিষ্যতে সহনীয় অবস্থা ধরে রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়বে'। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী বলেছেন, 'কেবল শাস্তি দিয়ে দুর্নীতি

ঠেকানো যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধ'। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য দেয়াল লিখন, ব্যানার টানানো এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় টকশো, বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা যেতে পারে। তাছাড়া দেশের ন্যূনাধিক তিন লক্ষ মসজিদের খতীবগণ জুম'আর খুৎবায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। যেহেতু এদেশের গণমানসে তাদের গভীর প্রভাব এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

(৫) বিভিন্ন পণ্যের উপর আরোপিত আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির কারণেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তাই আমদানী উৎসাহিত করতে কিছু জিনিসের শুল্ক হ্রাস করতে হবে।

(৬) আমাদের দেশের একশ্রেণীর মুনাফাখোর ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জনের নেশায় বুঁদ হয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারে তেলসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার করে। এবার বোরোর বাম্পার ফলন হওয়াই ভারতে ধান পাচারের সংবাদও পাওয়া গেছে। তাছাড়া উখিয়া ও টেকনাফের ২০টি স্পট দিয়ে মিয়ানমারে প্রত্যেক মাসে ২ লাখ লিটার জ্বালানি তেল পাচার হচ্ছে বলে জানা গেছে।[১৫] সেজন্য সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে পাচার রোধ করতে হবে।

(৭) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যেলায় যেলায় কাগুজে বাঘে পরিণত হওয়া টাস্কফোর্সকে সক্রিয় করতে হবে এবং পণ্য সরবরাহ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

(৮) ১৯৫৬ সালের 'কন্ট্রোল অব এ্যাসেনশিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট'-এর ৩ ধারা অনুযায়ী 'নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ' জারী করা হয়েছিল ১৯৮১ সালে। এর আওতায় 'প্রাইসেস এ্যান্ড মার্কেট ইন্টেলিজেন্স কর্তৃপক্ষ' নামে একটি বিভাগ কাজ করছিল। তারা অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা বন্ধ করতে আমদানী করা বা উৎপাদিত পণ্যের একটি সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দিত। এছাড়া নিয়মিত বাজার তদারক করা, সিন্ডিকেট বা অন্য কোন চক্রের মাধ্যমে সৃষ্ট যেকোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তাদের দায়িত্ব ছিল। ১৯৮৯ সালে এ বিভাগটিকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এটিকে পুনরুজ্জীবিত করা সময়ের অনিবার্য দাবী।

(৯) দেশে কৃষিপণ্যের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল মার্কেট ও পর্যাপ্ত কোল্ডস্টোরেজ গড়ে তুলতে হবে। এবার আলুর বাম্পার ফলন হওয়া সত্ত্বেও কোল্ডস্টোরেজের অভাবে আলু পচে যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

(১০) খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য রেশনিং পদ্ধতিতে গরীব, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, দরিদ্র বিধবা, ভূমিহীন কৃষক, শিল্পকারখানা-কোম্পানী-স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। সাথে সাথে খোলা বাজারে চাল বিক্রি অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। তাতে যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তারা কিছুটা হ'লেও স্বস্তি পাবে। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সরকারকে চালের দামের গতিরোধ করার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সংগ্রহ করা চাল ভর্তুকি মূল্যে বাজারে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

(১১) ১৯৭১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। তখন চালের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৯ লাখ টন। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি এবং চালের উৎপাদন ২ কোটি ৬ লাখ টন। তবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হিসাবে বর্তমানে চালের উৎপাদন ৩ কোটি টন। অথচ এখনও চালের ঘাটতি রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এ ঘাটতির পরিমাণ ২০ লাখ টনের বেশী। এ ঘাটতি পূরণ করতে চালের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, চড়া মূল্যে চাল কিনতে জনগণ যখন নাকাল হচ্ছে তখন কেনা দামের চেয়ে প্রতি কেজি ৭ টাকা বেশী দামে বিক্রি করে দরিদ্র জনগণের পকেট থেকে ২০০ কোটি টাকা খসিয়ে নিয়েছে সরকার।[১৬]

(১২) দেশের ৬৫ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০০৬-০৭ সালে কৃষি খাত থেকে আসে জিডিপি'র ২১ দশমিক ১১ শতাংশ। অথচ ৮২ হাযার হেক্টর জমি প্রতি বছর অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। দেশের মোট ফসলী জমির পরিমাণ ১৪২ দশমিক ২২ লাখ হেক্টর। এক ফসলী ২৬ দশমিক ৭৩ লাখ হেক্টর, দো-ফসলী ৪১ দশমিক ৩৪ লাখ ও তিন ফসলী ১০ দশমিক ২৭ লাখ হেক্টর। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি এখনো অনাবাদি ও পতিত রয়ে গেছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী শুধু বরগুনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি ও বরিশাল এই ৭টি যেলায় রবি, বোরো, আউশ ও আমন মৌসুমে পতিত থাকে নয় লাখ ১৩ হাযার ২১ হেক্টর জমি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগাতে হবে। এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী ও দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করতে হবে। অনাবাদি জমিগুলোকে চাষের আওতায় আনতে হবে এবং কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যে ফিলিপাইন আইন করে কৃষি জমি অকৃষি কাজে হস্তান্তর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের অনাবাদি জমিতে পরিকল্পিত চাষ করলে অতিরিক্ত ৫০ লাখ

১৫. *ইনকিলাব*, ১৪ জুন '০৮, পৃঃ ১২।

১৬. *ঐ*, ১৫ জুন '০৮, পৃঃ ১।

Contents

টন খাদ্য উৎপাদন সম্ভব। তাছাড়া সরকারী হিসাব মতে দেশে বর্তমানে যে ৫০ লাখ একর খাস জমি রয়েছে সেগুলোকেও চাষের আওতায় আনতে হবে।

(১৩) আমাদের দেশের চাষাবাদ পদ্ধতি এখনো মান্ধাতা আমলের। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এদেশের কৃষির আধুনিকায়ন করা গেলে দেশে বিদ্যমান জমি হ'তেই আগামী ৫০ বছরের বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

(১৪) জমিতে ভাল ফসল উৎপাদনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নিয়মিত পরিমিত পানি সেচ নিশ্চিত করা। অথচ আমাদের আবাদি জমির মাত্র ৫২ লাখ ৬৩ হাযার হেক্টর জমিকে এ পর্যন্ত পানি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। মোট জমির ষাট শতাংশই এখনো রয়ে গেছে সেচের আওতার বাইরে। সব চাষযোগ্য জমিতে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে ফসলের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে। কৃষিবিদদের ধারণা, দেশের শুধু বরেন্দ্র প্রকল্পের পুরো জমি সেচের আওতাভুক্ত করতে পারলে বছরে প্রায় ৪০ লাখ টন ফসল বেশী উৎপাদিত হবে। কৃষিবিদদের মতে দেশের অন্তত ৬০ ভাগ জমিকে সেচের আওতায় আনতে পারলে অন্তত ২ কোটি ৩০ লাখ টন আমন ফসল উৎপন্ন হবে আগামী আমন মৌসুমে। তাই অধিক উৎপাদনের জন্য কৃষিজমিতে সেচের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য ডিজেলের দাম সহনীয় পর্যায়ে রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।

'বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' (বিএডিএস)-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিতকরণ ও সার প্রয়োগ এবং চাষযোগ্য পতিত জমিকে সেচের আওতায় আনতে পারলে বছরে আরো সাত কোটি টন বেশী ধান উৎপাদন সম্ভব। বোরো চাষের জন্য অতিরিক্ত সেচ প্রদান এবং আমন ধানে সেচের ঘাটতির ফলে বর্তমানে উভয়ের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। সূত্র মতে, বর্তমানে দেশে হেক্টর প্রতি ৩.৬৬ টন বোরো এবং দুই টনের অধিক আমন উৎপাদন হিসাবে বছরে মোট ধান উৎপাদন হচ্ছে প্রায় তিন কোটি টন। কিন্তু বোরো হেক্টর প্রতি ৬ টন এবং আমন হেক্টর প্রতি ৫ টন উৎপাদন করা সম্ভব। বিএডিএস-এর এসিস্ট্যান্ট চীফ ইঞ্জিনিয়ার (বর্তমানে বুয়েটে সেচ ও উৎপাদন দক্ষতার উন্নয়ন বিষয়ে পিএইচ.ডি গবেষণারত) মুহাম্মাদ ইফতেখারুল আলমের মতে বোরোর প্রত্যাশিত উৎপাদন কম হওয়ার কারণ হচ্ছে জমিতে অতিরিক্ত সেচ প্রদান। তার মতে, বোরো চাষের জন্য যে পরিমাণ সেচ দেয়া প্রয়োজন তার চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশী সেচ দেন আমাদের কৃষকেরা। অতিরিক্ত সেচ দেয়ার ফলে সার মাটির এত গভীরে চলে যায় যে, ধানের চারা সেখান থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে না। সারের এই অপচয় উৎপাদন কমিয়ে দেয়। বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত আমন ধানে সেচ দেন না। এমনকি ধানের শিস বেরুনোর সময়ও, যা আমনের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশের কৃষকদের বীজ ও সার ব্যবহারের জ্ঞান মোটামুটি ভালই আছে; কিন্তু পরিমিত সেচের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান খুবই নগণ্য বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষকদেরকে পানি সেচের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে।[১৭]

(১৫) বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের চাপে দিন দিন আমাদের দেশে কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটেও ২০০৭-০৮ অর্থবছরের চেয়ে কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ কৃষকদের উৎপাদন আগ্রহে যেন ভাটা না পড়ে সেজন্য অন্যান্য দেশ ভর্তুকি বাড়াচ্ছে। ভেনিজুয়েলা তেল বিক্রির অর্থ খাদ্য উৎপাদনে ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ভর্তুকি দেয়ার ফলে তার কৃষি উৎপাদন বাড়ছে এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকছে খাদ্যদ্রব্যের দাম। যুক্তরাষ্ট্র কৃষকদের ধান উৎপাদন খরচের ৮৫ শতাংশ ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করে। ভারত ৬ শতাংশের বেশী, জাপান ৫ শতাংশের বেশী এবং পাকিস্তান দেয় প্রায় ৩ শতাংশ। চলমান খাদ্য সংকট দূর করার জন্য কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিতে ১ টাকা ভর্তুকি প্রদান করলে কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫ টাকা পর্যন্ত ফেরত আসে।

(১৬) বীজের আমদানীনির্ভরতা কমানোর জন্য দেশের আবহাওয়া উপযোগী বীজ উদ্ভাবনে কৃষি গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যে ৪৭টি উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের জাত আবিষ্কার করেছেন সেগুলোকে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, কেবল ভাল বীজ ব্যবহার করেই বাংলাদেশে ধানের ফলন শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহের জন্য মৃতপ্রায় বিএডিসিকে কার্যকর করতে হবে। বর্তমানে বিএডিসি বছরে ৯ লাখ টন উন্নতমানের বীজ চাহিদার মাত্র ৫ শতাংশ সরবরাহ করতে পারে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে বেসরকারী ও বিদেশী বীজ কোম্পানীগুলো। বীজ হয়ে পড়ছে আমদানীনির্ভর।

(১৭) যে কৃষক নিশিদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ফসল ফলায় অনেক সময় লাভ তো দূরে থাক খরচের টাকাও তার উঠে আসে না। তাছাড়া বর্তমানে কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং উপকরণ দুষ্প্রাপ্যতার ফলে কৃষকের ফসল ফলাতে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য কৃষি উপকরণের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রেখে উহার সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান করা অপরিহার্য।

---

১৭. *"Rice yield to leap on less irrigation", The Daily Star. 22 June '08, P. 1, 15.*

(১৮) এক পরিসংখ্যান মতে দেশে সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি ২৮ লাখ ২৩ হাযার। আর সরকারের নতুন হিসাব অনুযায়ী সাড়ে ২৪ শতাংশ বা প্রায় সোয়া কোটি মানুষ অর্ধবেকার। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য মতে, ২০০৯-১১ সময়ের মধ্যে এ সংখ্যা হবে দুই কোটি ৬৫ লাখ ৮০ হাযার। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দেশে প্রতিবছর শ্রমবাজারে নতুন মুখ যুক্ত হবে ১৮ লাখ ১০ হাযার। এর বাইরে রয়েছে আরও ১৮ লাখ ৮০ হাযার মানুষ, যারা কাজ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এই হিসাবে আগামী তিন অর্থবছরে নতুন কর্মসংস্থান তৈরী করতে হবে ৭৩ লাখ ২০ হাযার। দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই যুবক, আর এদের মধ্যে ৮৬ শতাংশই বেকার। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী দেশে প্রতিবছর কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ হারে। অথচ সেই তুলনায় বাড়ছে না কর্মসংস্থান। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে দেশে সার্বিক কর্মসংস্থান কমেছে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হারে। গত ১০ বছরে যুব জনসংখ্যার ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ০.২ শতাংশ। খাদ্য সংকট দূর করে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য দেশের এ বিপুলসংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের যে চাহিদা রয়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের গার্মেন্টস শিল্পকে ধ্বংস করার যে পায়তারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। সরকার পোশাক শিল্পে নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে 'শিল্পাঞ্চল পুলিশ' গঠন করতে যাচ্ছে বলে গত ১৮ জুন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) এমএ মতিন জানান।[১৮] এটি একটি ভাল উদ্যোগ বলা যেতে পারে।

(১৯) ১৯৭০ সালে এক ব্যারেল তেলের দাম ছিল মাত্র ১ মার্কিন ডলার। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈলের মধ্যে 'ইয়ম কিপুর' যুদ্ধে আরবরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'লে তৈলাস্ত্র প্রয়োগ তথা তেলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। ঐ সময় ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম দাঁড়ায় ৩ ডলার। ফলে মার্কিন চাপে মাত্র ৬ দিনের মাথায় এ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয় ইসরাঈল। ১৯৭৮ সালে ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ছিল ১৪ ডলার। ১৯৭৯ সালের ইরানী বিপ্লব ও ১৯৯১ সালে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর থেকে তেলের দাম সতত উর্ধ্বমুখী হয়েছে। ২০০৩ সালে ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ছিল ৩০ ডলার, ২০০৪ সালে ৪০ ডলার, ২০০৫-এ ৫৬ ডলার, ২০০৬-এ ৫৯ ডলার এবং ২০০৭-এ ৯৪ ডলার। এসব এখন ধূসর অতীত। গত ১১ জুলাই লন্ডনের বাজারে এক ব্যারেল তেলের দাম ছিল ১৪৭ দশমিক ২৫ ডলার।

১৮. *আমার দেশ*, ১৯ জুন '০৮, পৃঃ ৩।

বাংলাদেশে গত ৩০ জুন সরকার ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বাড়িয়েছে সাড়ে ৩৭ শতাংশ। ফার্নেস তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে ৫০ শতাংশ এবং সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বেড়েছে ৬৬ শতাংশ। পেট্রোল ও অকটেনের দাম বাড়ানো হয়েছে ৩৪ শতাংশ। গড়ে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে প্রায় ৩৬ শতাংশ। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসাবে আরেক দফা পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। যেন ঘি ঢেলে দ্রব্যমূল্যের আগুনকে আরো উত্তপ্ত করা হয়েছে। বেসরকারী গবেষণা সংস্থা 'সমুন্নয়' বলেছে, জ্বালানি তেলের দাম ৪০ শতাংশ বাড়ালে মূল্যস্ফীতি বাড়বে এক দশমিক আট শতাংশ। আর এতে নতুন করে ৮০ হাযার পরিবার বা চার লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যাবে। কেরোসিন-ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে গ্রাম ও শহরে দারিদ্র্য হার বাড়বে যথাক্রমে শূন্য দশমিক ৩১ ও শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ।

জ্বালানি সংকট থেকে উত্তরণের জন্য যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে বিকল্প জ্বালানির উৎস খুঁজে বের করতে হবে। কয়লা হ'তে পারে এ বিকল্পের অন্যতম অনুষঙ্গ। বাংলাদেশে উচ্চমানের প্রমাণিত কয়লার মজুদ প্রায় দুই হাযার ৩৫৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। আর সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ তিন হাযার ২৫৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ যাবৎ আবিস্কৃত কয়লা দিয়ে বাংলাদেশের অন্তত ৫০ বছর চলে যাবে। তাই কালবিলম্ব না করে জাতীয় কয়লানীতি চূড়ান্ত করার মাধ্যমে পর্যাপ্ত কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, ভারতে ৭০ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ শতাংশ, কোরিয়া ও জাপানে ৪০ শতাংশ এবং ফ্রান্সে ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় কয়লা দিয়ে। আর গোটা বিশ্বের ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় কয়লা দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ায় ৮০ ভাগ শিল্প কয়লাভিত্তিক। এছাড়াও রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইসরাঈলসহ বিভিন্ন দেশের জ্বালানির উৎস কয়লা। বাংলাদেশে এক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহার হচ্ছে মাত্র ১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এদেশের ৮৮ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় গ্যাস দিয়ে। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। তাছাড়া সম্প্রতি গ্যাস সংকটের কারণে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটে পড়েছে চট্টগ্রামের শিল্প-কারখানাগুলো। সেখানে বিদ্যুৎ সংকটের কারণে প্রতি মাসে পোশাক শিল্পেরই ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

বিশ্ববাজারে তেলের উর্ধ্বগতির কারণে পৃথিবীর অনেক দেশ পরমাণু জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে প্রায় সাড়ে ৪শ' পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৬২৬ ট্রিলিয়ন ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা

হয়, ২০৫০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন অর্ধেকে কমিয়ে আনতে হ'লে প্রতি বছর সাড়ে ১৭ হাযার বায়ু টার্বাইনের (Turbine) পাশাপাশি ৩২টি নতুন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। সম্প্রতি জাতিসংঘের আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) বাংলাদেশকে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশনের জরিপ থেকে জানা যায়, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে পতেঙ্গা পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ দিয়ে ইউরেনিয়াম ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে আগামী ২০ বছরে দশ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে ১৫শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আণবিক শক্তিভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহার করে উৎপাদন করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা ৬ হাযার মেগাওয়াট। সাথে সাথে পানি, বায়ু, বর্জ্য ও আখের ছোবড়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প জ্বালানি হিসাবে সৌর বিদ্যুৎও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত মিলে মোট ৩৮ লাখ মেট্রিক টন জ্বালানি তেলের প্রয়োজন হয়। এর সবটাই আমদানী করতে হয়।

বিকল্প জ্বালানির উৎস খুঁজে বের করার পাশাপাশি 'পঞ্চম জ্বালানি শক্তি' হিসাবে আখ্যায়িত জ্বালানি সাশ্রয়ী নীতিও অবলম্বন করতে হবে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে প্রায় প্রতিটি দেশ জ্বালানি সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে তারা জ্বালানি সাশ্রয়ী গাড়ী ব্যবহার, ছুটির দিনে সরকারী গাড়ী চলাচল বন্ধ, ছোট গাড়ী ব্যবহার, গণপরিবহন ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারী খাতে তেলের অপচয় ও চুরি বন্ধ এবং গ্যাস ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ করতে হবে। এই দুঃসন্ধিক্ষণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। অনেক দেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। জার্মানী বাল্টিক ও উত্তর সাগরের তীরের কাছে ৩০টি বায়ুখামার তৈরীর পরিকল্পনা করেছে। এগুলোর প্রায় তিন হাযার বায়ুকল থেকে ১১ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে।

ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের কতিপয় তরুণ বিজ্ঞানী আশাজাগানিয়া সংবাদ দিয়েছেন। চট্টগ্রামের রাউজানের জয়নাল আবেদীন জসিম মাত্র দেড় লিটার পানি দিয়ে ৯শ' কিলোমিটার গাড়ী চালানোর 'কমপ্রেসড ওয়াটার' প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন, গাজীপুরের আসাদুয্যামান মানিক ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন, নারায়ণগঞ্জের আবু ছালেহ বিনা জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দাবী করেছেন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস মিয়া আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট থেকে বায়োফুয়েল আবিষ্কারের দাবী করেছেন, নারায়ণগঞ্জের আরেক বিজ্ঞানী আযাদ রহমান খান সাগরের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথার্থতা প্রমাণিত হ'লে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২০) ইউরিয়া (প্রতি কেজি ৬ টাকার পরিবর্তে ১৩ টাকা) ও টিএসপি (২০ টাকা কেজির পরিবর্তে ৫৫ টাকা) সারের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে দ্রব্যমূল্যের উপর। এক হিসাবে বলা হয়েছে, এ বছর ২৮ লাখ ৫০ হাযার টন ইউরিয়া, ৫ লাখ টন টিএসপি ও ৪ লাখ ৫০ হাযার টন এমওপি সারের প্রয়োজন হবে। দেশী সারকারখানাগুলোতে মাত্র ১৭ লাখ টন ইউরিয়া উৎপাদিত হয়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব 'জীবাণু সার' ইউরিয়া সারের বিকল্প হিসাবে কৃষি উৎপাদনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বলে কৃষিবিদগণ মনে করছেন। এতে বছরে প্রায় পাঁচ হাযার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এবং ১০ লাখ টন ইউরিয়া সার কম লাগবে। বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে জীবাণু সার ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য বাড়ছে বিধায় কৃষকদেরকে কম্পোস্ট সার ও গোবর ব্যবহারে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

(২১) অর্থনীতির গতিকে সচল রাখার জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশে বিনিয়োগ কমে গেছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সরকারী বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা কমে হয়েছে ৫ দশমিক ০২ শতাংশ। বেসরকারী বিনিয়োগ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল জিডিপির ১৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। গত অর্থবছরে (২০০৬-০৭) তা ছিল ১৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ১১ শতাংশ, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২৪ দশমিক ০২ শতাংশ, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ২৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ১৯ শতাংশে। উল্লেখ্য, 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম' কর্তৃক প্রকাশিত 'দি গ্লোবাল কম্পিটেটিভনেস ইনডেক্স ২০০৭-০৮'-এ আর্থ-সামাজিক ও বিনিয়োগ দক্ষতার মাপকাঠিতে বিশ্বের ১৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সদ্য প্রকাশিত 'এনাবলিং ট্রেড ইনডেক্স' বা বাণিজ্যবান্ধব সূচকে ১১৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১১০তম স্থানে রয়েছে।

(২২) নিরাপদ খাদ্য নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলার জন্য শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেই চলবে না; বরং ভেতো বাঙ্গালীর ভাতের চাহিদা পূরণের সাথে সাথে পুষ্টির

Contents

যোগানের জন্য দুধ, ডিম ও গোশতের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ৯ দশমিক ৪২ মিলিয়ন টন দুধ, ৫ দশমিক ৭৮ মিলিয়ন টন গোশত এবং ১৯৪২৮ মিলিয়ন ডিমের ঘাটতি রয়েছে। পশু সম্পদের উপর গবেষণা চালিয়ে এ ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

(২৩) গ্রামীণ ব্যাংক সহ যেসব ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের সোল এজেন্ট নিয়েছে তারা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় কৃষি খাতে বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহী। কারণ তারা তো আসলে এদেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করতে চায় না, বরং দেশবাসীর দারিদ্র্যকে পুঁজি করে দারিদ্র্যের চাষ করতে বদ্ধপরিকর। গত ২৮ জুন এক কনভেনশনে টিআইবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, 'কৃষিক্ষেত্রে আপনাদের (এনজিও) অবদান কোথায়? আপনারা দারিদ্র্য মুক্তির কথা বলছেন, অথচ কৃষকদের উন্নতির জন্য আপনারা তো কিছু করছেন না। বরং কৃষকদের দাদন দিয়ে তাদের আরো গরীব করছেন'।[১৯] তাই সরকারের উচিত হবে কৃষি খাতে বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের জন্য এদের উপর চাপ প্রয়োগ করা। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে বিশ্বে বর্তমানে সাত হাযারের অধিক মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এদের সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখেরও বেশী। ক্ষুদ্রঋণের মডেল এখন বিশ্বের ৫৮টি দেশে অনুসৃত হচ্ছে।[২০] বর্তমানে দেশী-বিদেশী মিলে বাংলাদেশে ৫১ হাযার এনজিও রয়েছে।

(২৪) বলা হয়ে থাকে, "The rich are getting richer, because the poors are getting poorer". 'ধনীরা আরো ধনী হ'তে পারছে, কারণ গরীবরা আরো গরীব হচ্ছে'। সমাজে এই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার জন্য যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে। কারণ ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের অবদান অনস্বীকার্য। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, "If the Muslim of today only set aside the Zakat system as per rule laid down in the holy Quran, It can be said that all social problems and ailment can will be automatically removed". 'আজকের যুগের মুসলমানরা যদি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র যাকাত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতো, তাহ'লে যাবতীয় সামাজিক সমস্যা আপনাআপনি দূর হয়ে যেত'। ডঃ হাম্মুদাহ আব্দালাতি তাঁর "Islam in focus" গ্রন্থে বলেন, "Zakat mitigates to a minimum the suffering of the needy and poor members of society. It is a most comforting consolation to the less fortunate people, yet it is a loud appeal to everybody to roll up his sleeves and improve his lot". 'যাকাত সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে। এটি ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগণের জন্য সবচেয়ে কার্যকর সহায়তা। অধিকন্তু এটি তার অর্থনৈতিক হাতকে শক্তিশালী করা এবং তার ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সবার প্রতি জোরালো আহ্বান'। তিনি আরো বলেন, "It is authentically reported that there were times in the history of Islamic administration when there was no person eligible to receive zakah; every subject Muslim, Christian and Jew of the vast Islamic empire had enough to satisfy his needs and the rulers had to deposit the zakah collections in the public treasury". 'এটি প্রমাণিত সত্য যে, ইসলামী শাসনামলের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন যাকাত নেবার মতো কোন লোক ছিল না। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যে তখন মুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদী নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক তার অভাব মোচনে সক্ষম ছিল। ফলে শাসকবর্গকে যাকাতের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা রাখতে হ'ত'।

বেশ কিছু দিন আগের বেসরকারী এক হিসাব মতে, দেশে কোটিপতির সংখ্যা ১০ হাযার ছাড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে অন্তত ১০০ জন ১০০ কোটি টাকা বা তারও বেশী অর্থের মালিক। এরা সকলেই তাদের সঞ্চিত সম্পদ, মজুদ অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের কারবারের সঠিকভাবে যাকাত হিসাব করলে এবং প্রতিজন গড়ে আড়াই লক্ষ টাকা হারে যাকাত আদায় করলে ন্যূনতম বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হ'তে পারে।[২১] সম্প্রতি টিআইবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, 'বর্তমানে দেশে ৩৩ হাযার কোটিপতি আছেন'।[২২] এরা যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে তাহ'লে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যয় করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতঃ আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

(২৫) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যেখানে সরকারের সেখানে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন তাদের অনভিপ্রেত বক্তব্যের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢেলে তাকে আরো উস্কিয়ে দেন তখন রীতিমত হতবাক হ'তে হয়। গত ৫ জুলাই ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন: বাজেট ২০০৮-০৯' শীর্ষক সেমিনারে অর্থ উপদেষ্টা ডঃ এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয়

১৯. *ইনকিলাব, ২৯ জুন '০৮, পৃঃ ১১।*

২০. *"A Tribute to Dr. Muhammad Yunus and Grameen Bank", Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2. No. 2, July-December 2006, Dhaka, p. 6.*

২১. *প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার, পৃঃ ৪।*

২২. *আমার দেশ, ১৬ জুন '০৮, পৃঃ ১।*

দ্রব্যমূল্য কমার আর কোন সম্ভাবনা নেই'। ঐ সেমিনারে তিনি দ্রব্যমূল্য কমে আগের অবস্থায় ফিরে আসাকে 'অবাস্তব' বলে মন্তব্য করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে শায়েস্তা খাঁর আমলের সাথে তুলনা না করার জন্য আহ্বান জানান।[২৩] এছাড়া গত ১০ মে অর্থ উপদেষ্টা বিদেশ থেকে দেশে ফিরে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই বলে জানান।[২৪] জুন মাসের ৩০ তারিখে সরকার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়। কিন্তু অর্থ উপদেষ্টা এতদিন আগে তেলের দাম বাড়ানোর কথা বলায় সারা দেশে প্রায় চার হাযার পেট্রোলপাম্পের মালিক ও পরিবেশক তাদের ভূগর্ভস্থ ট্যাংকে অন্তত সাড়ে তিন কোটি গ্যালন (৩০ হাযার মেট্রিক টন) ডিজেল মজুদ[২৫] করে জনগণের পকেট থেকে কোটি কোটি টাকা লুটে নিল। তাই দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম দেয়ার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মুখেও লাগাম দিয়ে এ ধরনের অযাচিত বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী-দার্শনিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যথার্থই বলেছেন, "Many-a-time, we fail to reach our cherished goal, because our language is wrong". 'উল্টাপাল্টা কথার কারণে অনেক সময়ই আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হই'।

(২৬) সর্বোপরি ব্যবসায়ীদের মনে পরকালীন জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে যদি নৈতিকতাবোধের উন্মেষ না ঘটে তাহ'লে মজুদদারী ঠেকানো যাবে না। আর মজুদদারী ঠেকানো না গেলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরাও দুঃসাধ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা অবলম্বনের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করে বলেন, اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ 'সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী (ক্বিয়ামতের দিন) নবী, ছিদ্দীক্ব ও শহীদগণের দলে থাকবেন'।[২৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ. 'ক্বিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠরূপে উত্থিত হবে। তবে মুত্তাক্বী, সৎ ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী ব্যতীত'।[২৭] অন্য হাদীছে এসেছে, رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করবেন যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়ে কোমলতা ও উদারতা পোষণ করে'।[২৮]

মার্কিন তাত্ত্বিক ও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক উইলিয়াম ইঙ্গডাল তাঁর 'সীডস অব ডেস্ট্রাকশন: হিডেন এজেন্ডা অব জেনেটিক ম্যানিপুলেশন' গ্রন্থে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা জনসংখ্যাবহুল যে ১৩টি দেশকে আগামী দিনে খাদ্য নিরাপত্তার নামে কর্পোরেট স্বার্থের জালে আটকে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।[২৯] বেসরকারী সংস্থা 'সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান' (সুপ্র)-এর তথ্য মতে দাতা সংস্থাগুলো থেকে এক ডলার অনুদান গ্রহণের বিপরীতে বাংলাদেশকে দেড় ডলার ঋণের দেনা পরিশোধ করতে হয়। প্রতিবছর বাংলাদেশ ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান পায় তার গড়ে ৬৫ শতাংশই ঋণের সূদ-আসল বাবদ পরিশোধে ব্যয় করতে হয়। সুতরাং ষড়যন্ত্রের গভীরতা অনুভব করতঃ আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সূদখোর মহাজনদের খপ্পর থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে এসে কৃষিতে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটাতে হবে। বীজের আমদানীনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী জাত উদ্ভাবন ও তা জমিতে রোপণ করে পরিমিত সেচ ও সার প্রয়োগের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে হবে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির রাশ টেনে ধরার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, একটি দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তিনটি। (ক) রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (খ) সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও (গ) অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এ তিন দিক থেকেই আমরা যেন এখন হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সুশাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে সত্যিকারের কল্যাণরাষ্ট্র গড়তে হবে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যথার্থই বলেছেন, 'গরীব দেশগুলো খাদ্যাভাবকে পরাভূত করতে পারবে না। কারণ খাদ্য সমস্যার সমাধান কোন বীজের মধ্যে লুকানো নেই। তা লুকানো আছে আর্থ-সামাজিক সাম্য, মূল্যবোধ ও সুশাসনের মধ্যে'।

---

২৩. *ইনকিলাব, ৬ জুলাই '০৮, পৃঃ ১ ও ৮; আমার দেশ, ঐ, পৃঃ ১; প্রথম আলো, ঐ, পৃঃ ১ ও ২।*
২৪. *আমার দেশ, ১১ মে '০৮, পৃঃ ১ ও ১৩; প্রথম আলো, ঐ, পৃঃ ১।*
২৫. *প্রথম আলো, ২১ জুন '০৮, পৃঃ ১।*
২৬. *তিরমিযী; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৩৪২, হা/১৭৮২।*
২৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৯৯ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২/৩৪২, হা/১৭৮৫।*
২৮. *বুখারী; মিশকাত হা/২৭৯০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*
২৯. *ইনকিলাব, ৬ জুলাই, '০৮, পৃঃ ৭।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

ইসলাম ধর্মের নামকরণ ও ইবরাহীমী আদর্শ

*রফীক আহমাদ**

মহাক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানবান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির আদি পিতা বা প্রথম পুরুষ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর ফেরেশতাকুলের সিজদার দ্বারা আদম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেন। এতে ইবলীস বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে। ইবলীসের এই দুঃসাহসিকতায় পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা চরম অসন্তুষ্ট হন এবং অবমাননা ও ধিক্কার সহ তাকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু নির্লজ্জ ইবলীস (শয়তান) মানব জাতির আদর্শে কুঠারাঘাত করার প্রয়াসে আল্লাহ্র সমীপে এক আকুল আবেদন জানায়। অসীম রহস্যবিদ স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের আবেদন অনুমোদন করেন। ফলে ইবলীস মানুষের শত্রুতায় আমরণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এটাও মানব সম্প্রদায়ের কারো নিকট অনবহিত নয়। তবে সৃষ্টির প্রারম্ভেই ইবলীস তার সূক্ষ্ম ও কূটকৌশল দ্বারা আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-কে এক পরীক্ষায় পরাভূত করে। ফলে শয়তানরূপী ইবলীসের কৌতুহলোদ্দীপক দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যায় এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আদম (আঃ)-কে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালেও যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে স্থায়ীভাবে সুদৃঢ় রাখেন। এমনকি প্রয়োজনবোধে কোন কোন সময় কোন কোন নবী-রাসূলকে প্রাধান্যও দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى بَعْضٍ.

'আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ৫৫)*।

অনুরূপভাবে এক পর্যায়ে আল্লাহ্র অফুরন্ত রহমত ও নে'মতপ্রাপ্ত ইবরাহীম (আঃ) এক প্রতিকূল পরিবেশে আবির্ভূত হন। তাঁর পরিবারের সবাই এবং সে দেশের সমগ্র জাতি তখন মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিপরীত একটি পবিত্র ও সত্য ধর্মের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছায় পয়গম্বরসুলভ আচরণের মাধ্যমে নির্ভয়ে তাঁর জাতিকে এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তিপূজার নিন্দা করেন। এমতাবস্থায় ইবরাহীম (আঃ)-এর সর্বোৎকৃষ্ট সত্যানুরাগ, অকৃত্রিম আত্মসমর্পণ, চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপক গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে ভূমিক পালন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ، قَالَ لاَيَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ.

'যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন। তখন পালনকর্তা বললেন, আমি আপনাকে মানব জাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও। আল্লাহ বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না' *(বাক্বারাহ ১২৪)*।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্য তাঁর পসন্দনীয় ও মনোনীত ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মকেই এক ও অভিন্ন ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। আর এজন্যই নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। এর সাক্ষ্য স্বরূপ মহান আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ. 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। এই ঘোষণার স্বপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরও বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. 'যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(আলে ইমরান ৮৫)*। এজন্য পূর্ববর্তী উম্মত ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী কিংবা তাঁরা মুসলিম ছিলেন। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন,

إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'আমার বিনিময় হ'ল আল্লাহ্র দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, আমি যেন মুসলিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই' *(ইউনুস ৭২)*।

ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّ لَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا.

** শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

'ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম' *(আলে ইমরান ৬৭)*। এছাড়া ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) যেভাবে দো'আ করতেন তা ছিল ইসলাম বা মুসলিম হওয়ার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তাঁদের দো'আ হ'ল, رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ. 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে মুসলমান করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি মুসলিম দল সৃষ্টি করুন' *(বাক্বারাহ ১২৮)*।

লূত (আঃ)-এর কাহিনীতে এসেছে, فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ. 'আমরা লূতের জনপদে একটি ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোন ঘর পাইনি' *(যারিয়াত ৩৬)*। ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে যে দো'আ করতেন, যা থেকে তাঁর মুসলিম ও ইসলামের অনুসারী হওয়া প্রতীয়মান হয়। কুরআন মাজীদে এসেছে,

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ.

'আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করুন' *(ইউসুফ ১০১)*। মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে (উম্মতকে) সরাসরি বলেছিলেন, يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْآ إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে থাক, তাহ'লে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক' *(ইউনুস ৮৪)*।

বনী ইসরাঈলের আসল ধর্ম ইহুদীবাদ ছিল না; বরং ছিল ইসলাম। তৎকালীন বন্ধু ও শত্রু সবাই একথা জানত। কাজেই তাদের বাদশাহ ফের'আউন যখন নীল নদে ডুবে যাচ্ছিল, তখন যে শেষ কথাটি বলেছিল তা হ'ল,

أَمَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বূদ নেই আল্লাহ ছাড়া, যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল। বস্তুতঃ আমিও মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউনুস ৯০)*। আরও দেখা যায়, অন্যান্য নবীর মত সুলায়মান (আঃ)-এর দ্বীনও ছিল ইসলাম এবং তিনি ও তাঁর অনুসারীরা ছিল মুসলিম। সেজন্য সাবার রাণী বিলকীস তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে বলেছিলেন, أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. 'আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম' *(নামল ৪৪)*।

ঈসা (আঃ) ও তাঁর সহযোগীদের দ্বীনও ছিল ইসলাম। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ أَمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْآ أَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ.

'যখন আমি হাওরীদের প্রতি অহি পাঠালাম এই মর্মে যে, ঈমান আন আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি, তখন তারা বলল, আমরা ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকুন আমরা মুসলিম' *(মায়েদাহ ১১১)*।

উপরের আয়াতগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে যে, আমাদের দ্বীন বা ধর্মের নাম ইসলাম। তেমনি সকল নবীর যুগে এটিই ছিল একমাত্র দ্বীন। ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম- যা আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। এজগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহ্র নিকট মকবুল ছিল। কাজেই নিঃসন্দেহে ঐ সব ধর্মও ছিল ইসলাম। আর যিনি ইসলাম কবুল করেন তিনি হন মুসলিম, যা একটি মর্যাদাসম্পন্ন নাম। যদিও তৎকালীন সময়ে মানুষ বিভিন্ন নামে অভিহিত হ'ত। কিন্তু সবগুলোরই প্রকৃত অবয়ব ছিল ইসলাম, যার মর্ম ও অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্য। অবশ্য আলোচ্য ধারায় ইবরাহীমী ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম ইসলাম রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ' নামে অভিহিত করেছিলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর পর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে বর্তমান এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলিম'। এ উম্মতের ধর্মও ইসলাম।

ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা, তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত করার মহান প্রয়াসে জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেন যে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার। তোমরা আল্লাহ্র জন্য শ্রম স্বীকার কর, যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পসন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন

এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব মণ্ডলীর জন্য। সুতরাং তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী' *(হজ্জ ৭৭-৭৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِى الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِىَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ.

'ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, অনুগত হও। সে বলল, আমি বিশ্বপালকের অনুগত হ'লাম। এরই অছিয়ত করেছেন ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়া'কূবকে এই মর্মে যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না' *(বাক্বারাহ ১৩০-১৩২)*।

পৃথিবীর বুকে যেসব খ্যাতনামা ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি (পয়গম্বর) জন্মগ্রহণ করে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর আত্মিক পরিশুদ্ধি, জ্ঞান-বুদ্ধির বিস্ময়কর গভীরতা, আল্লাহ্র সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক এবং এক আল্লাহ্র উপর নিরলস ভরসাও ছিল অভাবনীয়। তাই সব কিছুর উপহারস্বরূপ তিনি খলীলুল্লাহ (আল্লাহ্র বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত হন। ইবরাহীম খলীলুল্লাহর দো'আর বরকতেই পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে বিশ্ববাসীর জন্য (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) অনুমোদন করেন। আল-কুরআনে এ বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। উপরের আয়াতগুলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ব জনগোষ্ঠীর চিরস্থায়ী কল্যাণার্থে শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেন। সর্বপ্রকার জ্ঞানের মহাভাণ্ডার কুরআনই বিশ্বের আদি হ'তে অন্ত পর্যন্ত সময়কালের জন্য বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ হিসাবে বরণীয়। আমরা এই মহাপবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান বাণীর দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মীয় আদর্শ, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তার বাস্তব প্রতিফলন উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. وَأَتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِى الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্র অনুগত এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। আমি তাকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি যে, ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(নাহল ১২০-১২৩)*।

আল্লাহ্র অফুরন্ত নে'মত ও নিদর্শনে ইবরাহীম (আঃ)-এর হতবিহ্বল উপলব্ধি সন্দেহাতীতভাবেই পৃথিবীবাসীর জন্য এক আলোকবর্তিকার ন্যায় হয়েছিল। তাই তৎকালীন অবিশ্বাসী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুধাবন কল্পে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا، وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلِلّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ مُّحِيْطًا.

'যে আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্ঠি বলয়ে' *(নিসা ১২৫-১২৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা। আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম, আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ করুন ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুলকিফলের কথা। তাঁরা প্রত্যেকেই গুণীজন। এ এক মহৎ আলোচনা। আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে' *(ছোয়াদ ৪৫-৫০)*।

Contents

ইসলামের ইতিহাস বিশেষ করে নবী-রাসূলগণের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর অমর জীবন কাহিনী ও তাঁর অকৃত্রিম আদর্শের বর্ণনা সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে অভিভূত করে। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, কামনা-বাসনা ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে অনঢ় থাকার যেসব অমর ইতিহাস তিনি স্থাপন করেছেন, তা বিস্ময়কর ও নযীরবিহীন। তাঁর অবিস্মরণীয় ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ্র তাঁকে উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন জগতের শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাই নবুওত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশাবলীকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়নের মহান ব্রত গ্রহণ করেন। অতঃপর মানবতার পূর্ণ বিকাশ সাধনে ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যার একমাত্র ধারক-বাহক বা কর্ণধার হিসাবে মহানবী (ছাঃ) দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অবশ্য কুরআনের মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদেশ-নিষেধ, দৃশ্য-অদৃশ্য, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এতে সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে অতীতের নবী-রাসূলগণের কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত ও বিস্ময়কর বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে।

অতঃপর আলোচ্য রচনার মূল প্রতিপাদ্য ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মাদর্শও বর্ণিত হয়েছে কুরআনের বিভিন্ন সূরায়। আর পাশাপাশি এর মৌলিক ও তাৎপর্যময় দিকগুলো অনুসরণ করার জন্য পুনঃপুন অহি এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, এখন সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও। যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(আলে ইমরান ৯৫)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি যে প্রত্যাদেশ এসেছে তা হ'ল 'তারা (বিধর্মীরা) বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি, যাতে বক্রতা নেই। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্য করি' *(বাক্বারাহ ১৩৫-৩৬)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাছারাও ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'হানীফ', (অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ) ও আত্মসমর্পণকারী। তিনি মুশরিক ছিলেন না। মানুষের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু' *(আলে ইমরান ৬৭-৬৮)*।

একই মর্মার্থে মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব এবং তাদের সন্তানদের উপর। আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী-রাসূলগণ তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না, আর আমরা তাঁরই অনুগত। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসন্ধান করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(আলে ইমরান ৮৪-৮৫)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তম আদর্শ পরবর্তী মানুষের জন্য অনুসরণীয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে, তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে'। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহ্র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনারই উপর ভরসা করেছি, আপনারই দিকে মুখ করেছি এবং আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' (*মুমতাহিনা ৪, ৫, ৬*)।

একই বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করে বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে

গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে। যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলুন, আমার ইবাদত, আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনি সবকিছুর প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে' *(আন'আম ১৫৯-১৬৪)*।

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে জগতের সর্ব ঊর্ধ্বে স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করতেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَآجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِي وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللهُ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ.

'আপনি কি সেই লোককে দেখেননি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে, একারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হ'লেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যুও ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ভ হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

আলোচ্য বিষয়ে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, 'স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখান, কেমন করে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্য চাইছি, যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। আল্লাহ বললেন, তাহ'লে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক তোমার নিকট তারা দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন' *(বাক্বারাহ ২৬০)*।

ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা'। এ মর্মে ইবরাহীম (আঃ)-এর সংগ্রামী জীবন ইতিহাসের কিয়দংশ উপরের আয়াতগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আমাদের মহানবী (ছাঃ)-কে ইবরাহীম (আঃ)-এর সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য সমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও তিনি বিশ্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী এবং আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তবুও আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ক্ষেত্রে ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণের আদেশ লাভ করেন। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টিকে অপরিসীম ভালবাসেন। এমতাবস্থায় যে কোন বান্দা তার ব্যক্তিগত মহৎ গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হ'তে পারেন। এরূপ অসংখ্য আল্লাহভীরু বান্দা আবহমানকাল ধরে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও রহমত লাভে ধন্য হয়েছেন এবং ক্বিয়ামত দিবসের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র ধর্মাদর্শকে ভালবাসা বা অনুসরণ করার জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র উদাত্ত আহ্বানকে উম্মতে মুহাম্মাদীর সার্বজনীন ভালবাসা হিসাবে সর্বান্তকরণে গণ্য করা যায়।

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও ভালবাসা পেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গৃহ কা'বা শরীফের অনুসন্ধান লাভ করেন এবং তা পুনঃ নির্মাণের দায়িত্বভারও প্রাপ্ত হন। তাঁর ধর্মীয় তত্ত্বের মহান আদর্শকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং তাঁর অনুসৃত ধর্মকে জগতের বুকে প্রাধান্য দিয়ে বহাল রাখা হয়, যা উম্মতে মুহাম্মাদী তথা আমাদের জন্য অনুমোদিত ধর্ম। এ পবিত্র জীবনাদর্শ পৃথিবীবাসীর আবহমান কালের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এর উপযোগিতাকে যথাযথ রাখার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর সকাতর দো'আ, প্রার্থনা, আকুল আবেদন- নিবেদন ইত্যাদি ছিল অত্যধিক। ফলে বড় বড় ইহুদী, খৃষ্টান, আলেমগণও নিজ ধর্মকে এড়িয়ে ইবরাহীমী ধর্মকে অকাতরে সমর্থন যুগিয়েছেন। উদাহরণতঃ একটি হাদীছ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইল সত্য দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য সিরিয়া থেকে রওনা করলেন। তখন (পথিমধ্যে সর্বপ্রথম) এক ইহুদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাঁকে তাঁদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, আমি হয়তো আপনাদের দ্বীন গ্রহণ করতে পারি। সুতরাং আমাকে আপনাদের দ্বীন সম্পর্কে

Contents

কিছু বলুন। তখন তিনি (ইহুদী আলেম) বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হ'তে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র গযব থেকে আপনার অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করলে আপনাকে আল্লাহ্‌র গযবের ভাগী হ'তে হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র গযব থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌র আযাব বিন্দুমাত্রও আমি বরদাশত করতে পারব না। আর তা বরদাশত করার ক্ষমতাও আমি রাখি না। তাহ'লে অন্য কোন ধর্মের দিকে আমাকে পথ দেখাতে পারবেন কি? তিনি (ইহুদী আলেম) বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না। তবে আপনি দ্বীনে হানীফ-এর অনুসারী হ'তে পারেন। যায়েদ বললেন, 'দ্বীনে হানীফ' কি? তিনি বললেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর আনীত দ্বীন। তিনি (ইবরাহীম) ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না এবং আল্লাহ ছাড়া (অন্য কিছুর) ইবাদত করতেন না। অতঃপর যায়েদ (সেখান থেকে) বেরিয়ে এক খৃষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং অনুরূপ আলাপ আলোচনা করলেন। তখন ঐ খৃষ্টান আলেম বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হ'তে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র লা'নতের অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। অর্থাৎ আমাদের ধর্মের অনুসারী হ'তে হ'লে আপনাকে আল্লাহ্‌র লা'নতের ভাগী হ'তে হবে। তিনি (যায়েদ) বললেন, আল্লাহ্‌র লা'নত কিংবা আল্লাহ্‌র গযবের বিন্দুমাত্র আমি বরদাশত করতে পারি না। আর না আমার তা বরদাশত করার ক্ষমতা রয়েছে। বরং অন্য কোন ধর্মের কথা আমাকে বলে দিতে পারবেন কি? উক্ত খৃষ্টান আলেম বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না। তবে দ্বীনে হানীফ গ্রহণ করতে পারেন। যায়েদ বললেন, 'হানীফ' কি? তিনি বললেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর আনীত দ্বীন। তিনি ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতেন না। যায়েদ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে তাদের উক্তি শুনে বেরিয়ে এলেন এবং বাইরে এসে দো'আ করে বললেন, হে আল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপর রয়েছি'। *(বুখারী)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর আল্লাহভীতি, ধর্মপরায়ণতা, মহানুভবতা, দৃঢ় প্রত্যয় উত্তম আদর্শের নমুনাস্বরূপ মহানবী (ছাঃ)-এর বর্ণিত ও সমর্থিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে আরও দু'টি হাদীছ পেশ করা হ'ল। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় তা ব্যাখ্যা করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আহলে কিতাবকে তোমরা বিশ্বাস করো না, আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না। বরং তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরের প্রতি নাযিল হয়েছে। যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সব নবীকে তাঁদের সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে দেয়া হয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্যও করি না, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই অনুগত *(বুখারী)*।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মধ্যে ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্নপদ, নগ্নদেহ এবং খাৎনাবিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে। (যথা আল্লাহ বলেন,) প্রথমে যে অবস্থায় মানুষকে সৃষ্টি করেছিলাম, একই অবস্থায় আমি তাকে ফিরিয়ে নেব (অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি করব)। ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আঃ)-কে পোষাক পরান হবে। *(বুখারী)*।

উপরে বর্ণিত হাদীছগুলো দ্বারা কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনার ও বাস্তবতার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের বাণীর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয় ও প্রণিধানযোগ্য। প্রসঙ্গত ইবরাহীম (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক সাধনা সবিশেষ দো'আ অন্তর্যামী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হওয়ায় তাঁর মতাদর্শ সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ইবরাহীম (আঃ)-এর পুণ্যময় অনাবিল আদর্শ এক সম্মানজনক ও বিরল সাফল্যের প্রতীক রূপে পবিত্র কুরআনেও স্থান লাভ করেছে। এসব সুস্পষ্ট অভিমত ও মহাপুরস্কারের নেপথ্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর হৃদয়বিদারক দো'আ ও প্রার্থনার প্রতিফলন অনস্বীকার্য।

Contents

নবীনদের পাতা

ইসলামে পানাহারের বৈশিষ্ট্য

*হাফেয মুকাররম**

(শেষ কিস্তি)

আঙুল চেটে খাওয়া

পাত্রের সাথে সাথে হাতের আঙ্গুলিগুলোও চেটে নিতে হবে।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ فِيْ أَيَّةٍ الْبَرَكَةَ.

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খাওয়ার শেষে আঙ্গুলিসমূহ ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'খাদ্যের কোন্ অংশটির মধ্যে বরকত আছে নিশ্চয়ই তোমরা তা জান না'।[৬৭] কা'ব ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তিন আঙ্গুলে খানা খেতেন এবং হাত মুছার (ধোয়ার) পূর্বে তা চেটে নিতেন।[৬৮] আঙ্গুলি নিজে চেটে নিতে অক্ষম হ'লে অন্যের দ্বারা যেমন স্বামী-স্ত্রী, পিতা-সন্তান পরস্পর এক অপরের আঙ্গুলি চেটে নিবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'ত বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَلَايَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

'যখন তোমাদের কেউ কিছু খায়, তখন সে যেন আঙ্গুল নিজে চেটে নেয় অথবা অন্যের দ্বারা চাটিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত মুছে না ফেলে'।[৬৯] আমরা যে খাদ্য খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিই সে খাদ্য তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাই খাদ্য রেখে দেয়া অন্যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে ভয়ের কারণ মনে কর। আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আল্লাহর কোন নির্দেশকে বরকত মনে করতাম। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে খাদ্য খেতাম, তখন খাদ্যের তাসবীহ পড়া শুনতে পেতাম।[৭০]

খাদ্য শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

যে কোন শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা যেমন সুন্নাত, কাজ শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলাও অনুরূপ সুন্নাত। আমরা যা-পানাহার করি তার সবকিছুই যে আল্লাহর নে'মত এতে কারো দ্বিমত নেই। তাই সবকিছুতে তুষ্ট থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর;যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি। আর তোমরা যদি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর তা'হলে তার শুকরিয়া আদায় কর *(বাক্বারা ১৭২)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সে বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, যে একগ্রাস খাদ্য খেয়ে তার প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তার শোকর আদায় করে'।[৭১] আল্লাহর কৃতজ্ঞতা কেনইবা প্রকাশ করবো না। 'তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে *(নাহল ১০-১১)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে অবশ্যই তোমাদেরকে আরও দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর' *(ইবরাহীম ৭)*। সুতরাং যে কোন কাজ শেষে সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রতেকের জন্য আবশ্যক।

খাদ্য শেষে দু'আ পাঠ করা

যে কোন খাদ্য খাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'আ পাঠ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। আবু উমাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখ থেকে (খাওয়া শেষে) যখন দরস্তরখানা উঠানো হ'ত, তখন তিনি এ দু'আ পড়তেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَ لاَ مُوَدَّعٍ وَ لاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

উচ্চারণঃ *আল-হামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরাং ত্বাইয়িবাম মুবারাকাং ফীহি। গইরা মাকফীইন ওয়ালা মুওয়াদ্দাঈন ওয়ালা মুস্তাগনা আনহু রব্বানা।*

অর্থঃ 'পাক পবিত্র, বরকতময় অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ারদেগার! আপনার নে'মত হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, আপনার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন থেকেও মুক্ত থাকা যায় না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কেউ উক্ত দো'আ পড়লে তার পূর্বের গোনাহ সমূহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন।[৭২]

আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (ছাঃ) যখন কিছু খেতেন বা পান করতেন তখন এই দু'আ পড়তেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

উচ্চারণঃ *আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমা ওয়া সাক্বা ওয়া সাওয়াগাহু ওয়া জা'আলা লাহু মাখরাজা।*

অর্থঃ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি খাওয়ায়েছেন, পান করিয়েছেন ও অতি সহজে উদরস্থ করিয়েছেন এবং (অপ্রয়োজনীয় অংশ) বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন'।[৭৩]

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৬৭. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৬ 'খাদ্য' অধ্যায়।*
৬৮. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮৫।*
৬৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮৭।*
৭০. *ছহীহ বুখারী, তিরমিযী হা/৩৬৩৩।*
৭১. *ছহীহ মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০১৮।*
৭২. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০১৭।*
৭৩. *আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৪২০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০২৪।*

মু'আয ইবনু আনাস তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আহার করবে অতঃপর বলবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةَ.

উচ্চারণঃ *আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানী হাযা ওয়া রযাক্বানীহি মিন গইরি হাইলিম মিন্নী ওয়া কুওয়াতা।*

অর্থঃ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ্যও প্রদান করলেন, যাতে আমার কোন উপায় ও শক্তি ছিল না'।[৭৪] রাসূল (ছাঃ) খাওয়া শেষে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন-

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ঈমনা খইরাম মিনহু।*

অর্থঃ হে আল্লহ! আপনি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।[৭৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওয়া ও পানি পান শেষে শুধু 'আল-হামদুলিল্লা'ও বলতেন।[৭৬]

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে প্রচলিত اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[৭৭] আর مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ তথা مِنْ শব্দটি যঈফ হাদীছেও নেই

মেহমানদারী করা

মেহমান আপ্যায়নের নীতি পূর্বে থেকে চলে আসছে। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বিভিন্ন হাদীছ থেকে জানতে পারি। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখ, সে যেন অবশ্যই মেহমানদের সম্মান করে'।[৭৮] আবু শুরাইহ আল-কা'বী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। অতিথির জন্য খানা-পিনার ব্যবস্থা করে, যদিও একদিন ও এক রাত হয়। সাধারণত আতিথিয়েতা হ'ল তিনদিন। এরপর যা করবে তা হবে ছাদাকা। আর মেহমানের এটা জায়েয নয় যে, এত সময় মেযবানের ঘরে অবস্থান করবে, যাতে তার কষ্ট হয়।[৭৯] নিজে না খেয়ে বা তুলনামূলক কম খেয়ে অপরকে খাওয়ানো ছিল ছাহাবীদের অভ্যাস। সুতরাং মেহমানদের সম্মান করা আবশ্যক। তবে মেহমানদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে মেযবানের দিকে।

মেযবানের মেহমানের দু'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু বুছরা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বাড়ী আসলেন। অতঃপর আমরা তাঁর সামনে কিছু খাদ্য ও খেজুর উপস্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখান থেকে কিছু খেলেন।... অতঃপর তাঁর সামনে পানীয় আনা হলে তা পান করে চলে যাচ্ছিলেন। তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাহনের লাগাম ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কিছু দু'আ করেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ করলেন,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণহঃ *আল্ল-হুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ারহামহুম।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তাতে বরকত দিন, তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং তাদের উপর রহমত নাযিল করুন'।[৮০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ছাহাবীর বাড়ীতে কিছু পান করার পরে দো'আ করেছিলেন,

اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِيْ مَنْ سَقَنِيْ.

উচ্চারণহঃ *আল্ল-হুম্মা আত্বঈম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বী মান সাক্বানী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করালো আপনি তাকে আহার করান এবং যে আমাকে পান করালো আপনি তাকে পান করান।[৮১] উল্লেখ্য, খাওয়া শেষে হুযুরদের দ্বারা হাত তুলে দো'আ করিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়, কখনো বা ইমামদের বাধ্য করা হয় যা সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যবনিকাঃ ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও শাশ্বত জীবন বিধান। এতে মানব কল্যাণের সবকিছুই রয়েছে। ইসলামের জীবনাদর্শের মূল উৎস হল আল্লাহর অহী তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে তা বাস্তবায়ন অপরিহার্য। তা কেবল ধর্মীয় জীবনের জন্য নির্দিষ্ট নয়; ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রেই পালনীয়। আল্লাহর ইবাদতের জন্যই বেঁচে থকা আর বেঁচে থাকার জন্য আহার। এই আহারে রাসূলের নীতির বাস্তবায়ন কোন অংশে তার গুরুত্ব কম নয়। সুতরাং আসুন! চলতে ফিরতে উঠতে-বসতে, শয়নে-স্বপনে সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধমে একনিষ্ঠ মুমিন হিসাবে পরিগণিত হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!।

৭৪. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, হা/৪০২৩; সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৮৯, ৭/৪৭।*
৭৫. *তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/৪২৮৩।*
৭৬. *ছহীহ মুসলিম হা/৪২০০; তিরমিযী।*
৭৭. *যঈফ আবু দাউদ হা/৩৮৫০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪২০৪-এর টীকা।*
৭৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৫৯।*
৭৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬০।*
৮০. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৭; ঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩১৫ 'আল্লাহর নামসমূহ' অধ্যায়, 'বিভিন্ন সময়ের দু'আ' অনুচ্ছেদ।*
৮১. *ছহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড হা/২৩৫৫, 'পান করা' অধ্যায়।*

Contents

চিকিৎসা জগত

চুলের যত্নে হারবাল

দেহের সমগ্র স্থানে চুল গজায় শুধু ২টি স্থান বাদে। তাহ'ল হাত ও পায়ের তলা। তবে কোন কোন জায়গায় চুল এত সূক্ষ্ম যে, খালি চোখে দেখা যায় না। চুল কেরাটিন জাতীয় এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে তৈরী। এই প্রোটিন ত্বকের বহিরাবরণের ফলিকল থেকে উৎপন্ন হয়। নতুন কেরাটিন কোষ গঠিত হয়ে পুরাতন কেরাটিনকে ঠেলে পাঠাতে থাকে। এটাই চুলের বৃদ্ধি। চুল বছরে ৬ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। আমরা যে চুল দেখি তা মৃত কেরাটিন কোষ। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মাথায় ১ লাখ থেকে ১ লাখ ৫০ হাযার চুল থাকে। প্রতিদিন ১০০টি চুল মাথা থেকে ঝরে পড়ে যায়। অতএব চিরুনিতে চুলের গোছা দেখলেই টাক-এর পূর্ব লক্ষণ মনে করার কোন কারণ নেই। হাযার বছর ধরে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে সব গোত্রের নর-নারীই চুল পড়া নিয়ে সংবেদনশীল। প্রাচীন মিশরীয়, রোমান ও গ্রীকরা মাথার চুলকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করত। সম্রাট সিজার তার পরাজিত শত্রুর মাথার চুল কেটে ফেলতেন পরাজয়ের প্রতীক হিসাবে।

আয়ুর্বেদীয় দর্শন:

আয়ুর্বেদ দর্শন অনুযায়ী চুল হ'ল অস্থির (Bone) উপজাত দ্রব্য। অস্থিকলা (Bone tissue) যা বিপাক ক্রিয়ায় যে কোন গোলযোগ, যা পরিপাক অগ্নির উপর নির্ভরশীল, সেখান থেকে চুলের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হ'তে পারে। চুলের প্রকৃতি নির্ভর করে শারীরিক গঠনের উপর।

বায়ু: বায়ুপ্রধান লোকদের চুল হয় হালকা, শুষ্ক ও কোঁকড়ানো।

পিত্ত: পিত্ত প্রধান ব্যক্তির চুল হয় লালচে বা বাদামী। এই চুল সহজে ধূসর বর্ণ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশী থাকে।

কফ: কফ প্রধান ব্যক্তির চুল তৈলাক্ত, কাল, দৃঢ়। মাথায় প্রচুর চুল থাকে।

টাক রোগের প্রকারভেদ:

১. **এলোপেশিয়া এরিয়েটা:** এসব রোগীরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বালিশে চুল চুল দেখতে পায়। এদের মাথার এক বা একাধিক অংশের চুল সম্পূর্ণ পড়ে যায়। ধারণা করা হয় ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে এ ধরনের টাক সৃষ্টি হয়।

২. **এলোপেশিয়া ফোলিকুলারিস:** চুলের ফলিকল (Follicle)-এর প্রদাহ থেকে চুল পড়ে যায়।

৩. **এলোপেশিয়া নিউরোটিকা:** স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা থেকে চুল পড়ে যায়।

৪. **এনড্রোজেনিক এলোপেশিয়া:** প্রচলিত নাম হ'ল মেল প্যাটার্ন বাডনেস। সাধারণত ২০ বছর থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত সময়ে এ রোগ হয়। চুলের সীমানা পেছনের দিকে সরে যায়। এতে কয়েক বছর লাগতে পারে। কোন কোন মহিলার রজঃনিবৃত্তির পর এমনটা হ'তে পারে। হাসপাতালে বৃদ্ধদের ওয়ার্ডে পুরুষ টাক রোগীর পাশাপাশি মহিলা টাক রোগীও দেখতে পাওয়া যায়।

৫. **এলোপেশিয়া টোটালিস:** এ রোগে মাথার চুল সম্পূর্ণরূপে পড়ে যায়। এমনকি চোখের ভ্রুও ঝরে যেতে পারে।

৬. **এলোপেশিয়া ইউনিভারসালিস:** এ রোগে মাথার সব চুলের পাশাপাশি শরীরের সমস্ত লোম পড়ে যায়। হঠাৎ দুঃসংবাদ বা দুর্ঘটনা থেকে এমন হ'তে পারে।

৭. **এলোপেশিয়া সেনাইলস:** বার্ধক্যজনিত টাক।

৮. **এলোপেশিয়া এডানটা:** জন্মগতভাবেই টাক।

৯. **ট্রাইকোটিলো ম্যানিয়া:** কারো কারো নিজের চুল নিজে ছিঁড়ে ফেলার মানসিকতা থেকে মাথায় টাক পড়ে। এক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়।

চুল পড়া চিকিৎসায় ভেষজ ওষুধের ব্যবহার:

সৃষ্টিকর্তার দেওয়া গাছ, লতাপাতায় ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। যেমনটি আছে বাজারের প্রচলিত চুল পড়ার ওষুধের মধ্যে। টাক সমস্যার চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ আজকাল এমন সব কেমিক্যাল মাথায় ব্যবহার করছে যা ডেকে আনছে মারাত্মক বিপদ। অথচ অবহেলায় জন্মানো কালোকেশী, মহাভৃঙ্গরাজ, ভূঁই আমলা, স্বর্ণলতা ইত্যাদি গাছ ব্যবহার করে টাক সমস্যার সমাধান করা যায়।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি:

মহাভৃঙ্গরাজ গাছে আছে Wedelolactone নামক উপাদান। যা চুলের গোড়ার ফলিকলকে মযবূত করে এবং ক্ষতিকর DHT-এর আক্রমণ প্রতিহত করে। মহাভৃঙ্গরাজ গাছ দিয়ে তৈরী মর্ডাণ তৈল ব্যবহারে চুলের গোড়া থাকে সতেজ। ক্ষতিকর DHT-এর প্রভাবেও চুল পড়ে যায় না। এটা ব্যবহারে চুল হবে ঘন, কালো, সতেজ। এতে দেখাবে তারুণ্যদীপ্ত।

কালোকেশী গাছে আছে Triterpene glycoside নামক রাসায়নিক উপাদান ও Ecliptine নামের এলকালয়েড। এই উপাদানগুলো লিভারের সমস্যা দূর করে। লিভারের সমস্যার কারণে টেস্টোস্টেরন হরমোনের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরণ DHT তৈরী হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসক একমত যে, DHT চুলের ফলিকলকে মেরে ফেলে ও চুল ফেলে দেয় এবং স্থায়ীভাবে টাক সৃষ্টি হয়। কালোকেশী গাছ দিয়ে তৈরী মডার্ণ ওষুধ সেবনে লিভার থাকবে সতেজ। চুলের শত্রু DHT তৈরী হবে না।

ঘরে তৈরী ওষুধ:

খাদ্য বা জীবন-যাপনের অভ্যাস যা পিত্তের দোষ বাড়াচ্ছে তা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সেই রকম খাদ্যাভাস বা জীবন যাপন পরিহার করতে হবে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধি কাষায়ম পিত্তের দোষ আরোগ্য করতে সহায়তা করে। আয়ুর্বেদিক টনিক চ্যাবনপ্রাশ চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমলকী, বাবলা দিয়ে চুল ধোয়া যায়। প্রতিদিন মলত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমলকী, হরিতকী, বহেড়া সমন্বয়ে তৈরী ত্রিফলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সবুজ শাক, সালাদ, ফল রাখতে হবে। গোসল করার পর ভালভাবে মাথা ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যাবে এবং সিবারিয়াম গ্রন্থিকে সক্রিয় করবে।

গাজর বা লেটুসের রস পান করা যেতে পারে। কাঁচা দনিয়া পাতার রস মাথায় লাগানো চুলের জন্য মঙ্গলজনক। সপ্তাহে ২-৩ বার মেথীচূর্ণ দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলা যেতে পারে। দুধের সাথে যষ্ঠিমধু বেটে পেষ্ট বানিয়ে মাথায় লাগালে চুল বেড়ে যায়। মাথায় ভূঁই আমলা ঘষে নিয়ে ৩০ মিনিট পর গোসল করলে উপকার পাওয়া যাবে।

[সংকলিত]

Contents

ক্ষেত-খামার

ফল সমৃদ্ধিতে বহুস্তর বাগানের ভূমিকা

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮২.৯০ লাখ হেক্টর জমি থেকে খাবার আসছে প্রায় ১৫ কোটি জনগোষ্ঠীর। গত ত্রিশ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়েনি। বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে গড়ে ৯২৬ জন মানুষ। ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ একদিকে যেমন কমে যাচ্ছে, সেই সাথে কমছে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও। অন্যদিকে মোট খাদ্যশস্যের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সে জন্য অতিরিক্ত খাদ্যঘাটতি মেটাতে নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশী খাদ্য আমদানি এবং দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যের উপর। অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রায় ৮০% নাগরিক পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। দামী খাবার যেমন মাছ, গোশত, ডিম, দুধ আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। তাই বেশী পরিমাণ ফল উৎপাদন করে পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব। একজন মানুষের শারীরতাত্ত্বিক ও মানসিকভাবে সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ৮৫ গ্রাম করে ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা খাই মাত্র ৩৫-৩৮ গ্রাম, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

আবার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি দেশের শতকরা ২৫% স্থান বনাঞ্চল তথা উদ্ভিজ্জ আচ্ছাদন থাকা প্রয়োজন। অথচ আমাদের প্রকৃত উদ্ভিজ্জ আচ্ছাদন মাত্র ৮.৫%, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং জাতীয় চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বনভূমি বা কৃষি জমি বাড়ার যেখানে কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে ফলদ ও বনজ গাছের সাথে কৃষি/উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মিশ্র চাষের সমন্বয়ে আনুভূমিক চাষ বিন্যাসকে কয়েকটি স্তর বিশিষ্ট উল্লম্ব চাষ বিন্যাসে রূপান্তরের মাধ্যমে বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল বাগান করে একক জমিতে ফলন বাড়ানোর বিকল্প নেই।

বহুস্তর বাগান কি?

মূলত বহুস্তর বিশিষ্ট বাগান হচ্ছে বিভিন্ন চাষযোগ্য বৃক্ষ, বিরুৎ ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতির বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ৩-৪ স্তর বিশিষ্ট উল্লম্ব ক্যানোপি সহযোগে গঠিত উদ্ভিদগুলোর একটি নিবিড় সহাবস্থান।

বহুস্তর বাগানের সুবিধা:

এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশের মত ভূমি স্বল্পতার দেশে এ পদ্ধতির বাগান কৃষিতে এক যুগান্তকারী উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে। ভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- আলো, মাটির পুষ্টি উপাদান, পানি ইত্যাদির সর্বাধিক ব্যবহার এ পদ্ধতিতে সম্ভব। এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে চাষকৃত বিভিন্ন উদ্ভিদ উল্লম্বভাবে বিভিন্ন স্তর থেকে সূর্যালোক গ্রহণ করে। আমাদের মোট যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে তা ২০-৩০ ভাগ ব্যবহার করে উপরের স্তর অর্থাৎ বৃক্ষ, ২০-৪০ ভাগ ব্যবহার করে মধ্য স্তর অর্থাৎ বিরুৎ এবং সর্ব নিম্ন স্তরে থাকে ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ, যা বাকি ২০-৩০ ভাগ সূর্যের আলো গ্রহণ করে।

অন্যদিকে এদের মূলতন্ত্র মাটির বিভিন্ন গভীরতা থেকে মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে। যেমন- ছায়া প্রদানকারী উদ্ভিদ যা মাটির উপরের স্তর থেকে পুষ্টি নেয়। মধ্যম স্তরের উদ্ভিদ যা মাটির আরো নিচে এবং উপরের স্তরের উদ্ভিদ মাটির আরো গভীর থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে। এতে করে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা হয়।

এ উৎপাদন পদ্ধতি আর্থিকভাবে কৃষকের জন্য ঝুঁকিমুক্ত। কেননা কোন কারণে কৃষক এক স্তরের ফসলপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হ'লেও অপর স্তর থেকে ফলন পায়। এছাড়াও বছরব্যাপী এ ধরনের বাগান থেকে অর্থ পাওয়া সম্ভব। কেননা একই জমিতে বিভিন্ন ফসল থাকায় বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তা সংগ্রহ ও প্রয়োজনে বিক্রয় করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিজ্জ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। একই জমিতে বছরের প্রায় সব সময়ই বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিজ্জের উপস্থিতি ফসল চাষে বহুমুখিতার পাশাপাশি ফসল তথা উদ্ভিদের বৈচিত্র্য আনয়ন করে।

নিবিড় চাষ করা হয় বিধায় বসতবাড়ির মহিলারা বা বেকার যুবকরা উৎপাদন কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে। ফলে বেকার সমস্যা দূরীকরণে এ ধরনের বাগান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য ধারণকৃত বহুস্তরবিশিষ্ট বাগানের কাঠামো:

ভূমিসংলগ্ন লতাপাতা সমৃদ্ধ নিম্নস্তর, বৃক্ষসমৃদ্ধ উচ্চস্তর এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্তর নিয়েই বসতবাড়ির বহুস্তর বাগান। নিম্নস্তরটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করে ১ মি. এর কম উচ্চতা বিশিষ্ট সর্বনিম্নস্তরে আনারস, শাকসবজি ও ঔষধি গাছ এবং ১-৩ মি. উচ্চতায় কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। উপরের স্তরটিও দু'টি ভাগে ভাগ করে ২৫ মি. বেশী উচ্চতায় সুউচ্চ কাষ্ঠল ও ফলদ বৃক্ষ যেমন- আম, কাঁঠাল, নারিকেল এবং ১০-১২ মি. উচ্চতায় মাঝারি উচ্চতার ফল যেমন- বামন আকৃতির আম, লিচু, সফেদা ইত্যাদি এবং কাষ্ঠল উদ্ভিদ লাগানো যেতে পারে।

বহুস্তর বিশিষ্ট বাগানের জন্য উদ্ভিদ/ফসল নির্বাচন:

বহুস্তর বিশিষ্ট বাগানের উদ্ভিদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। বাগানে গাছ লাগানোর জন্য ছায়া পসন্দকারী বা ছায়াসহ্যকারী উদ্ভিদ/ফসল চিহ্নিত করতে হবে। নির্বাচিত বিভিন্ন ফসল/উদ্ভিদের সমন্বয় এমন হ'তে হবে যেন ফসল উৎপাদন চক্র এবং মাত্রা সারা বছর নিয়মিত উৎপাদন বজায় রাখতে পারে। আবহাওয়া ও জলবায়ুগত কারণে বছরের কতক সময় ফসল সংগ্রহের পরিমাণ কম বা বেশী হ'তে পারে। কিন্তু প্রাত্যহিক কিছু না কিছু উৎপাদন যেন থাকে। অর্থাৎ বছরের প্রায় সব সময়ই যেন ফলন এবং উপজাত হিসাবে জ্বালানি ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়।

বাগানে উৎপাদিত সামগ্রী কৃষকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং অতিরিক্ত আয়, অন্যান্য কৃষি ফসল হানিতে ও দু'ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষককে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে। পারিবারিক সদস্যদের ন্যূনতম শ্রমের মাধ্যমেই বাগানে ফসল পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ সম্পন্ন হয় এমন হ'তে হবে।

সফল বহুস্তর বাগানের কয়েকটি মডেল:

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বসতবাড়িই এক একটি অপরিকল্পিত বহুস্তর বিশিষ্ট বাগান বা বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল চাষ ক্ষেত্র। কারণ

দেশজ সব ধরনের ফল, শাকসবজি, জ্বালানি এবং আসবাব তৈরীর কাঠ আসে বসতবাড়ী, বসতবাড়ী সংলগ্ন আঙিনা অথবা বসতবাড়ীর সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড থেকে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি বসতবাড়ীতে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে বহুস্তর ফসল বাগানের কাঠামো বর্তমান আছে, তা অপরিকল্পিত হওয়ায় সেসব বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল উৎপাদন কাঠামো হ'তে সর্বাধিক ফসল আসছে না। পরিকল্পিতভাবে এসব স্থানে যদি বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল উৎপাদন করা যায়, তবে এসব বাগানের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। বিষয়টির উপর গবেষণা করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টারে ১৯৯১ সাল থেকে পরিকল্পিতভাবে বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল চাষের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আম, নারিকেল, নিম ও শিশু বাগানের নিচে মধ্যস্তরে সফলভাবে কলা, লেবু, পেয়ারা, পেঁপে এবং সর্বনিম্নস্তরে আনারস, আদা, হলুদ, কচু, রসুন এবং ঔষধি উদ্ভিদ অ্যালোভেরা, অ্যাসপ্যারাগাস, মিসরিদানা প্রভৃতি ফলানো সম্ভব হয়েছে।

নারিকেল বাগানে ৩ স্তরবিশিষ্ট ফসল চাষ:

গ্রাম ও খামার বনায়ন প্রকল্পের অধীনে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ স্তরবিশিষ্ট যে ফসল চাষ করে তার প্রথম স্তর কচু, আদা, হলুদ, আনারস, অ্যালোভেরা, অ্যাসপ্যারাগাস, মিসরিদানা, দ্বিতীয় স্তর কলা, লেবু, পেঁপে ও পেয়ারা এবং ৩য় স্তর নারিকেল গাছের সমন্বয়ে গঠিত, যা বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল চাষের ইতিবাচক দিক নির্দেশক এবং অর্থনৈতিকভাবেও গ্রহণযোগ্য।

চার বছর গবেষণার পর দেখা গেছে যেন নারিকেল থেকে প্রতি বছর হেক্টরপ্রতি শুধু ৩৬,৭২০/- টাকার মত আয় হয়। কিন্তু বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল বিন্যাস (নারিকেল+কলা+ আনারস+আদা/কচু) থেকে ৩-৪ গুণ (টাঃ ১৫০৯৬০-২৭১৩২০/-) বেশী আয় করা যায়। এখানে উল্লেখ্য, নারিকেল গাছ তার নিম্নস্তরে চাষকৃত ফসলের পরিচর্যা থেকে পরোক্ষভাবে উপকার পেয়ে থাকে।

আম বাগানে ৩ স্তর বিশিষ্ট ফসল চাষ:

আম বাগানে মধ্যম স্তরে পেঁপে এবং নিম্নস্তরে আনারস ভাল জন্মে। ফল গাছ উন্নয়ন প্রকল্পের আম বাগানে মধ্যমস্তরে পেঁপে/পেয়ারা/লেবু গাছের নীচে আনারস সফলভাবে ফলানো সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের তিন স্তর বিশিষ্ট ফসল চাষে আর্থিক লাভও কম নয়। চার বছর গবেষণার পর দেখা গেছে যে, প্রতি বছর হেক্টরপ্রতি শুধু আম থেকে ১২০,০০০/- টাকার মত আয় হয় কিন্তু বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল বিন্যাস (আম, আনারস ও পেঁপে) থেকে আমের অনুৎপাদন মৌসুমে ১,৬০,০০০/- এবং উৎপাদন মৌসুমে ২,২০,০০০/- টাকার মত লাভ পাওয়া যায়।

আম বাগানের নীচে মধ্যম স্তরে পেয়ারা এবং নিম্নস্তরে ঔষধি গুল্ম অ্যালোভেরা, অ্যাসপ্যারাগাস ও মিসরিদানা সফলভাবে উৎপাদন করা যায়। উল্লেখ্য, এই ঔষধি গুল্মগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে ফসলের জমিতে এককভাবে চাষ করা হচ্ছে, যা আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য মূল্যবান জমিকে আরো কমিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং ঔষধি উদ্ভিদকে অবশ্যই বহুস্তর বিশিষ্ট বাগানের আওতায় চাষ করা একান্ত প্রয়োজন।

উডলটে ৩ স্তর বিশিষ্ট বাগানের মডেল:

শিশুগাছভিত্তিক অথবা ঘোড়ানীম গাছভিত্তিক বনজ বৃক্ষের উডলটে তিনস্তর বিশিষ্ট বাগান করা সম্ভব। এই ধরনের বাগানের সর্বোচ্চ স্তরে কাষ্ঠল উদ্ভিদ শিশু অথবা ঘোড়ানীম গাছ, মধ্যম স্তরে, পেয়ারা অথবা লেবু এবং নিম্নস্তরে আনারস, বিভিন্ন সবজি, মসলা জাতীয় ফসল ও বীরুৎ জাতীয় ঔষধি উদ্ভিদের চাষ করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টারের শিশু ও ঘোড়নীমের উডলটে ১০ বছরের গবেষণায় দেখা গেছে যে, উডলটভিত্তিক বহুস্তর বাগানের উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণ ও প্রচলিত বাগান হ'তে অনেক বেশী। আর্থিকভাবেও এ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা লাভজনক।

বহুস্তর বিশিষ্ট বাগানের পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা:

সর্বাধিক ফল ও বায়োমাস পেতে বহুস্তর বিশিষ্ট বাগানের ফসল ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে গাছ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাছ/ফসল লাগানো থেকে সর্বশেষ ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সঠিক উদ্যানতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং উদ্ভিদ ও এর সহযোগীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত হয়। পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত প্রুনিং ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে একক জমিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক গাছ সফলভাবে জন্মানো সম্ভব।

গাছের সঠিক ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে প্রুনিং করলে প্রতিটি আলাদা গাছ থেকে এর বিভিন্ন উপজাতসহ সর্বোচ্চ ফলন আশা করা যায়। ফলদ, বনজ ও কৃষি ফসল মধ্যকার সু-সংঘবদ্ধতার উপরই গাছের নীচে বা পার্শ্বে জন্মানো ফসলের সর্বাধিক ফলন নির্ভর করে। নিম্নস্তরের কৃষি ফসলের সঠিক পরিচর্যা করলে তা দ্বারা মধ্যম ও উপরের স্তরের বৃক্ষ উপকার পাবে। তাই বহুস্তর বাগানে ফসলের আন্তঃপরিচর্যা অত্যন্ত যত্নের সাথে করতে হবে। বাগানকে কখনই অপরিষ্কার ও জলাবদ্ধরাখা যাবে না। বর্ষাকালে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার:

ফল, জ্বালানি, আসবাব তৈরীর কাঠ ও বহুবিধ কৃষি সামগ্রী পাওয়ার সাথে সাথে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বসতবাড়িতে অথবা ফলের বাগানে বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য। উদ্ভাবিত মডেল বাংলাদেশের ২ কোটি বসতবাড়ী সংলগ্ন জায়গায় এবং বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আম, পেয়ারা, সুপারি এবং লিচু বাগানে, পূর্বাঞ্চলের কাঁঠাল বাগানে এবং বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্রাম ও খামার বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রায় সারাদেশেই এ মডেলটি সম্প্রসারণের উপযোগিতা লাভ করেছে। বর্তমানে 'সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন'-এর অর্থায়নে 'এগ্রোফরেস্ট্রি ইমপ্রুভমেন্ট পার্টনারশিপ প্রকল্প' (এএফআইপি)-এর তত্ত্বাবধানে সারা দেশে এ প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এ ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে বন্যামুক্ত জমিতে নতুন বাগান সৃজনের ক্ষেত্রে বহুস্তর বিশিষ্ট বাগানের মডেল অনুসরণ করলে তা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে।

[সংকলিত]

কবিতা

স্বাগতম রামাযান

- আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আহলান সাহলান
স্বাগতম রামাযান,
সদা খুশি মনে মোরা
তব করি আহ্বান।
এসো তুমি ধরা পরে
পাতকী যে তরিতে,
বল তুমি ওঠো মোর
নেকী ভরা তরীতে।
মুসলিম ওঠো জেগে
দেখ মোর তরণী,
অলসতা ছেড়ে এসো
ওগো মোর বরণী।
নেও নেও লুটে নেও
যত পার পুণ্য,
আখিরাতে চাইলে হ'তে
মুক্তি পেয়ে ধন্য।
এ ধরাতে পাবে তুমি
অতি বেশী সম্মান,
আল্লাহ্‌র কাছে রবে
উঁচু শির উঁচুমান।
তোমাকে জানাই মোরা
স্বাগতম হে রামাযান!
পাতকী তরিতে ফের
হ'লে তুমি আগুয়ান।

***

কোথায় মূল্যবোধ

-জুলিয়া আখতার
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

মিতভাষিতা যেন এক স্বপ্নের
ঘি মাখা পরোটা
মিথ্যা খেল হরহামেশা
সত্যের বাঝছে বারোটা
বিবেক পন্থে জ্যাম লেগেছে
মনুষ্যত্বের গাড়িটা॥
মন বিলাসী এয়ারকন্ডিশনে
অন্যায় মিঞার বসবাস
ঠক চাতুরির চাপে পড়ে
ন্যায় বেচারার নাভিশ্বাস।
দুর্নীতি বাবু পিশাচ মোড়ল
খিলখিলিয়ে হাসে
সুনীতি যেন বন্দী আসামী
পরিণত হয়েছে শীর্ণ লাশে॥
পাপ বিদগ্ধ মরুর ধরায়
নেই যেন কোন প্রতিরোধ
চারিদিকে শুধু হাহাকার
কোথায় আজ মূল্যবোধ?

***

মাহে রামাযান

-আবু রায়হান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

মিষ্টি মধুর সুরে ডাকছে
পাক মাহে রামাযান,
উদার মনে খুশি হয়ে
দিচ্ছে সাড়া মুসলমান॥
নেকী অর্জনের মোক্ষম সময়
এই মাহে রামাযান,
তাইতো সে নতুন করে
করছে সবাইকে আহ্বান॥
পুণ্য অর্জনের এ মাসে
সকল পাপাচার থাকবে বন্ধ,
সবার মুখে ধ্বনিত হবে
কুরআন-হাদীছের ছন্দ॥
বিনা কারণে যে ভাঙবে
রামাযানের একটি ছিয়াম,
হাশরের ময়দানে বিচারে
সে হবে না সফলকাম॥
এ মাসে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ
থেকে আমরা বিরত থাকি,
মনে প্রাণে সর্বক্ষণ
মোদের প্রভুকেই শুধু ডাকি॥

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জনসংখ্যা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। ৬৫৪ কোটি। ২। ১৯৪ টি। ৩। ১৩২ কোটি।
৪। ৮ম। ৫। ১২টি দেশে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। হলুদ ২। উকুন ৩। টমেটো
৪। আনারস ৫। লবণ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী বিষয়ক)

১। কোন মাছ সবচেয়ে চঞ্চল প্রকৃতির?
২। কোন মাছ সাগরতলে প্রতি ঘন্টায় ৯ মাইল পাড়ি দেয়?
৩। সবচেয়ে কম ঘুমায় কোন প্রাণী?
৪। সবচেয়ে বেশী ঘুমায় কোন প্রাণী?
৫। কোন প্রাণী লাফাতে পারে না?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয় কেন?
২। রান্না করার হাড়ি-পাতিল সাধারণত এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী হয় কেন?
৩। স্বাভাবিক আদর্শ পরিবেশে পানির ঘনত্ব কত তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ মান পরিগ্রহ করে?
৪। ফুলানো বেলুনের মুখ ছেড়ে দিলে বাতাস বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটি ছুটে যায়। কোন ইঞ্জিনের নীতির সঙ্গে এর মিল আছে?
৫। তাপ প্রয়োগে বেশী প্রসারিত হয় কোন পদার্থ?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

মানিকহার, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা ৮ জুন রবিবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় মানিকহার দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ সালমা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুহাম্মাদ নাঈম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন। সমাপনী ভাষণ পেশ করেন অত্র শাখার পরিচালক ক্বারী মুহাম্মাদ মানছূর রহমান।

বসতল, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ১৩ জুন শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় বসতল ছিদ্দীকিয়া সালাফিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ আনছারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল আলম ও মাওলানা আবুবকর প্রমুখ। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি আক্বীদা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রামাযান আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুহাম্মাদ পারভেজ হুসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম। অনুষ্ঠানে সোনামণি বসতল শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ জুন বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়া প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার দায়িত্বশীল ও সদস্যদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি চরিত্র গঠন ও নেতার আনুগত্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয সাইফুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হাফেয শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি মারকায শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল আউয়াল।

বংশাল, ঢাকা ৫ জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব বংশালস্থ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয়ে সোনামণি ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি বলেন, আজকের সোনামণি আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় হ'লে দেশ ও জাতি অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাবে। তিনি সকল সোনামণিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ঢাকা যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি ঢাকা যেলার নব মনোনীত পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সোনামণি ঢাকা যেলার নব মনোনীত সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ও সোনামণি ঢাকা যেলার নব মনোনীত সহ-পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল আলম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৬ জুলাই রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে, সোনামণি রাজশাহী যেলা ও মহানগরীর পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর, সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। তিনি সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ে তুলে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি নবমনোনীত দায়িত্বশীলদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইউনুসুর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার সভাপতি জনাব আফাযুদ্দীন, নওদাপাড়া মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয আরীফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সেবা খাতে দুর্নীতি বেড়েছে

বর্তমান তত্ত্বাবধায় সরকারের আমলেও দুর্নীতির ব্যাপকতা অব্যাহত রয়েছে। গত বছরের তুলনায় দুর্নীতির ব্যাপকতা কোন কোন খাতে সামান্য কমলেও বেশ কিছু খাতে বেড়েছে। শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এরপরই স্থানীয় সরকার ও ভূমি প্রশাসনের অবস্থান। অন্য দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা খাতগুলো হচ্ছে- বিচার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, এনজিও ও কর বিভাগ। বিভিন্ন খাতে সেবা পেতে জনগণকে বছরে গড়ে ৫ হাযার ৪৪৩ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। গত ১৮ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) এক খানা জরিপে এসব তথ্য প্রকাশ করেছে। টিআইবি ২০০৭ সালের জুন ও জুলাইয়ে দেশের ৬২টি যেলায় গ্রামের ৩ হাযার ও শহরের ২ হাযার মোট ৫ হাযার খানায় (পরিবার) এ জরিপ চালায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কাছ থেকে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে ৯৬ দশমিক ৬ ভাগ পরিবারকে দুর্নীতির শিকার হ'তে হয়েছে। তবে টাকার অংকে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি হয়েছে ভূমি প্রশাসনে। এ খাতে এক বছরে ঘুষের পরিমাণ ১ হাযার ৬০৬ কোটি টাকা। গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন সেবা পেতে এক-তৃতীয়াংশ খানা (পরিবার) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ৪২ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে সেবা পেয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা পেতে গড়ে প্রতি খানাকে ৪ হাযার ১৩৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবাগ্রহীতা প্রদত্ত মাথাপিছু ঘুষের পরিমাণ ৮৬১ টাকা। সার্বিকভাবে জনপ্রতি মাথাপিছু আয়ের ৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ ঘুষ দিতে হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষণায় দেখা যায়, আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কাছ থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৯৬ দশমিক ৬ ভাগ, স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে সেবা নিতে ৫৩ দশমিক ৪ ভাগ, ভূমি খাতে ৫২ দশমিক ৭ ভাগ, বিচার ব্যবস্থায় ৪৭ দশমিক ৭ ভাগ, স্বাস্থ্য খাতে ৪৪ দশমিক ১ ভাগ, শিক্ষা খাতে ৩৯ দশমিক ২ ভাগ, বিদ্যুৎ খাতে গড়ে ৩৩ দশমিক ২ ভাগ, ব্যাংকিং খাতে ২৮ দশমিক ৭ ভাগ, এনজিও খাতে ১৩ দশমিক ৫ ভাগ এবং কর খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৬ দশমিক ৪ ভাগ খানা। অন্যান্য সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৩১ দশমিক ২ ভাগ খানা এবং টাকার অংকে এ খাতে ঘুষের পরিমাণ ৭০৭ কোটি টাকা।

দুর্নীতি রোধের জন্য টিআইবি দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো বেশী সক্রিয়, দক্ষ ও কার্যকর করা, বিচার বিভাগকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত সময়ে নিষ্পত্তি করা, দুর্নীতিবাজকে শাস্তি দেয়া, জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, জীবনযাত্রার সঙ্গে সমন্বয় রেখে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতাদি বৃদ্ধিসহ মৌলিক প্রশাসনিক সংস্কার করা প্রভৃতি সুপারিশ পেশ করেছে।

পানি খাতে দুর্নীতি:

গত ২৬ জুন রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) প্রকাশিত 'গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৮: করাপশন ইন দ্য ওয়াটার সেক্টর' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন খাতে বার্ষিক বরাদ্দের শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগই দুর্নীতির কারণে অপচয় হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়, পানি খাতে দুর্নীতির ফলে একটি পরিবারকে পানি সংযোগ পেতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। খাবার পানি, স্যানিটেশন এবং পানি সরবরাহের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি বাড়ছে, বিশেষ করে নীতি প্রণয়ন ও ভবন নির্মাণের বাজেট থেকে শুরু করে পানি খাতের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পর্যন্ত সর্বত্র। এতে এ খাতে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেবার মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সরবরাহ কমছে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, এ খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এবং টেন্ডার সংক্রান্ত কাজে আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয় বেশী। সেচ ব্যবস্থা, নদী খনন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের মতো পানি খাতের প্রধান প্রধান উন্নয়নমূলক প্রকল্পে রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রকৌশলী ও অন্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় দুর্নীতি করে থাকে।

চট্টগ্রাম কাস্টমে দুর্নীতি:

যৌথ বাহিনীর নযরদারির কারণে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে আমদানী-রফতানী প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘুষ-দুর্নীতি কমলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এখনো অবৈধ লেনদেন চলছে। অবৈধ লেনদেনের জন্য কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী, আমদানী-রফতানীকারক এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও আগাম চুক্তিও হচ্ছে। তবে সার্বিকভাবে ২০০৪ সালের তুলনায় বর্তমানে ঘুষ-দুর্নীতির মাত্রা অনেক কমেছে। গত ২১ জুন চট্টগ্রাম চেম্বার মিলনায়তনে টিআইবির 'চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক খসড়া গবেষণা পতিবেদন প্রকাশের সময় এই তথ্য উপস্থাপন করা হয়। গত বছরের জুন থেকে এ বছরের (২০০৮) মে মাস পর্যন্ত সময়কে এই গবেষণায় বিবেচনা করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, পণ্য আমদানী প্রক্রিয়ায় এখনো আমদানীকারককে চারটি পর্যায়ে ৪২টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। আর এসব ধাপ দ্রুত করতে 'স্পিড মানি' হিসাবে ঘুষ দিতে হয়। এতে বলা হয়, ২০০৪-২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এমওটি (মার্চেন্ট ওভারটাইম) মাশুল বাবদ দুই কোটি ২৫ লাখ টাকার হিসাব পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, গত ১১ জুন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক হাযার ৪৪৫ কোটি টাকা বেশী রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম কাস্টমে কত টাকার ঘুষের লেনদেন হয় তার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর আগে গত বছরের ১২ মে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, '২০০৬ সালে বন্দর ও কাস্টম হাউসে মোট ৯৪৩ কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয়'।

এনজিওকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেছেন, সামাজিক উন্নয়নে এনজিওগুলো কতটা কাজ করছে তা ভেবে দেখার সময় হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনজিওকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে বিদেশী টাকায় এবং বিদেশীদের পরামর্শে চলার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এনজিওগুলোকে হ'তে হবে স্বনির্ভর। নতুবা সামাজিক উন্নয়নের প্রকৃত কাজটি এনজিওরা করতে পারবে না। গত ২৮ জুন রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে 'বেসরকারী উন্নয়ন

সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন' শীর্ষক কনভেনশনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এনজিওকে আপনারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন। এর ফলে এনজিওর মূল লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ ও কয়েকটি এনজিওর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ক্ষুদ্রঋণের নামে অনেক এনজিও টাকা নিয়ে ভেগে যাচ্ছে। বড় বড় কর্পোরেট এনজিওগুলো আরো অনেক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এনজিওগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হ'লে এসব সংস্থার অর্থনৈতিক বিবরণী প্রকাশ করা উচিত বলে তিনি মত দেন।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি

গত ৩০ জুন সরকার দ্বিতীয় দফা জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়িয়েছে। অকটেন, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ও এলপিজি অর্থাৎ সব ধরনের জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে। গড়ে প্রায় ৩৬ শতাংশ হারে তেলের দাম বেড়েছে। অকটেন প্রতি লিটারে ২৩ টাকা বেড়েছে। অকটেনের বর্ধিত মূল্য প্রতি লিটার ৯০ টাকা, আগে ছিল ৬৭ টাকা। পেট্রোলের বর্ধিত মূল্য প্রতি লিটার ৮৭ টাকা, আগে ছিল ৬৫ টাকা। লিটারপ্রতি বেড়েছে ২২ টাকা। কেরোসিন ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য লিটারপ্রতি করা হয়েছে ৫৫ টাকা, যা আগে ছিল ৪০ টাকা। লিটারপ্রতি কেরোসিন ও ডিজেল বেড়েছে ১৫ টাকা করে। ফার্নেস অয়েল লিটারপ্রতি ১০ টাকা বাড়িয়ে ৩০ টাকা করা হয়েছে। এলপিজি লিটারপ্রতি ৪০০ টাকা বাড়িয়ে ১ হাযার টাকা করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের লোকসান কাটিয়ে ওঠা এবং আন্তর্জাতিক বাজার ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে তেলের মূল্য সমন্বয় করতেই এই মূল্য বৃদ্ধি বলে জানিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মুহাম্মাদ মুহসিন। তবে তেলের মূল্য বৃদ্ধির পেছনে যে যুক্তিই দেখানো হোক না কেন, ইতিমধ্যে এ কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আরেকদফা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন শিল্পকলকারখানা বন্ধের উপক্রম হয়েছে। পরিবহন ভাড়া বেড়ে গেছে। খাদ্য নিরাপত্তা হয়েছে হুমকির সম্মুখীন। উল্লেখ্য, গত বছরের ২ এপ্রিল তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল।

সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ৬৫তম

যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরিচালিত 'ওয়ার্ল্ড ভ্যালুজ সার্ভে' শীর্ষক জরিপ থেকে জানা গেছে, বিশ্বের মধ্যে সুখী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম। বিশ্বের ৯৭টি দেশে পরিচালিত এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে ডেনমার্ক। গণতন্ত্র, সামাজিক সমতা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করে ডেনমার্ক। সুখী দেশের তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থান করছে যিম্বাবুয়ে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে কম সুখী দেশ এটি। আর এ তালিকায় বিশ্বের এক নম্বর ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ১৬তম। এর আগে রয়েছে পর্টোরিকো, কলম্বিয়া, আইসল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এল সালভেদর, মাল্টা, লুক্সেমবার্গ, সুইডেন এবং নিউজিল্যান্ড। সিঙ্গাপুরের চেয়ে সঊদী আরবের লোকেরা অধিক সুখী। সিঙ্গাপুরের অবস্থান হচ্ছে ৩১ ক্রমিকে। অপর দিকে সঊদী আরব হচ্ছে ২৬ ক্রমিকে। জাপানের অবস্থান ৪৩, ইটালী ৪৬, চীন ৫৪, ভারত ৬৯, পাকিস্তান ৮২ এবং ইরাক ৯২তম। জরিপের ফলাফল মতে ১৯৮১ সালে সুখী মানুষের দেশ হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল ৪৫টি এবং ২০০৭ সালের জরিপে এ সংখ্যা বেড়ে ৫২ হয়েছে।

বিশ্বে মেঘনা নদীর পানি সবচেয়ে স্বচ্ছ ও নিরাপদ

বিশ্বে যত বড় নদী আছে তার মধ্যে বাংলাদেশের মেঘনা নদীর পানিই সবচেয়ে স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ। চীনের হোয়াংহো বা ইয়েলো নদীর পানি সবচেয়ে খারাপ। আর ইউরোপের রাইন নদীর পানি এখনো বিষাক্ত। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান এবং বাংলাদেশের গঙ্গা ও যমুনা নদীর পানির মানও ভাল নয়। বিশ্বের বড় বড় নদীর উপর পরিচালিত এক আন্তর্জাতিক গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ উইলিয়াম হোলস্যারের নেতৃত্বে দশ সদস্যের এক বিজ্ঞানী দল প্রায় ২০ বছর ধরে এ গবেষণা করেন। এ বিজ্ঞানী দলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ডঃ রইসউদ্দীন আহমাদ। মেঘনা নদী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ নদীর পানি খুবই পরিষ্কার। এজন্য মেঘনার মাছ সুস্বাদু। মেঘনা নদী রুই ও কাতল মাছের উপযুক্ত আবাসস্থল। এ দু'টি মাছ প্রচুর শ্যাওলা খায়। মেঘনার ক্লিন পানির জন্য এখানে শ্যাওলা জন্মে প্রচুর। তিনি আরো জানান, এ গবেষণার জন্য মূলত বিশ্বের বড় বড় ৭/৮টি নদী বেছে নেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদী, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদী, মিসর ও সূদানের নীল নদ, ইউরোপের রাইন নদী, চীনের হোয়াংহো নদী, বাংলাদেশের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদী, পাকিস্তানের সিন্ধু নদী এবং ভিয়েতনামের মেকং নদী। এসব নদীর পানি সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন মৌসুমে এবং বিভিন্ন গভীরতায় ও তাপমাত্রায়। ঐসব নদীর পানি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মেঘনা সবদিক থেকে একটি পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও প্রাণবন্ত নদী।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ '০৮ অনুমোদন

'না' ভোটের বিধান রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮-এর নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন প্রার্থী তিনটির বেশী আসনে নির্বাচন করতে পারবেন না। আগে ৫টি আসনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ ছিল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হ'লে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন করতে হবে। গত ১৩ জুলাই বিকালে প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব সৈয়দ ফাহিম মুনায়েম জানান, অধ্যাদেশে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়নপত্রের সঙ্গে ঐ নির্বাচনী এলাকার মোট ভোটারের এক শতাংশের স্বাক্ষরযুক্ত দলীল সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। অধ্যাদেশে 'না' ভোট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রার্থী পসন্দ না হ'লে একজন ভোটার 'না' ভোট দিতে পারবেন। এজন্য ব্যালট পেপারে 'উপরের কাহাকেও নহে' লেখা একটা ঘর থাকবে। কোন আসনে 'না' ভোটের সংখ্যা ঐ আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের অর্ধেক বা তার বেশী হ'লে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন বাতিল করে কমিশনকে জানিয়ে পুনঃনির্বাচন ঘোষণা করতে পারবেন।

অধ্যাদেশের খসড়ায় বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থিতা, মনোনয়ন পদ্ধতি, তহবিল সংগ্রহ ও খরচের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা রাখার বিধান সংযোজন করা হয়েছে। অনিবন্ধিত কোন দলের সঙ্গে রাজনৈতিক মোর্চা গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলো কোন ছাত্র সংগঠন বা বিদেশে কোন শাখা রাখতে পারবে না বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ায় বলা হয়, কেউ ফৌজদারী অপরাধে দুই বছর বা তার বেশী সময়ের জন্য দণ্ডিত হ'লে আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সাজা খেটে মুক্ত হওয়ার পর ৫ বছর অতিক্রান্ত না হ'লে ঐ ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হ'তে পারবেন না। এ অধ্যাদেশ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছে।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল গত ২৬ জুন একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর পাসের হার অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ৯ বোর্ড মিলিয়ে পাসের হার ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ। গত বছর পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৩৬ ভাগ। পাসের গড় বৃদ্ধি শতকরা ১৩ দশমিক ৮২ ভাগ। চলতি বছর ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৭০ দশমিক ৮১ ভাগ। যা গত বছরের চেয়ে ১৬ দশমিক ০১ ভাগ বেশী। মাদরাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৮২ দশমিক ০৬ ভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাসের হার ৬২ দশমিক ৮৮ ভাগ। ৯ বোর্ড মিলিয়ে এবার জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ৫২ হাযার ৫০০ জন। যা গত বছরের চেয়ে ৯ হাযার ২৭১ জন বেশী। এ বছর শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত বছরের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার ৯ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৬ হাযার ৫৬৯ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ২৬ হাযার ৫৬৩ জন। ফেল করেছে ২ লাখ ৮০ হাযার ৬ জন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ৯৬ হাযার ৪৮৯ জন ছাত্র এবং ৩ লাখ ৩০ হাযার ৭৪ জন ছাত্রী পাস করেছে। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লাখ ৪৩ হাযার ৬০৯ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৫ লাখ ২৬ হাযার ৫৭৬ জন। ফেল করেছে ২ লাখ ১৭ হাযার ৩৩ জন। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাসের হার ঢাকা বোর্ডে ৭৭ দশমিক ৮১ ভাগ। রাজশাহী বোর্ডে ৬৪ দশমিক ৮৯ ভাগ, কুমিল্লা বোর্ডে ৭৩, যশোর বোর্ডে ৭১ দশমিক ৪৩, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭২ দশমিক ৬২, বরিশাল বোর্ডে ৬৮ দশমিক ৭৭ এবং সিলেট বোর্ডে ৫৩ দশমিক ৮৮ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে।

দাখিল: এবারও পরীক্ষার ফলাফলে মাদরাসা বোর্ড সর্বোচ্চ পাসের হারের গৌরব অর্জন করেছে। দাখিল পরীক্ষায় এ বছর পাসের হার ৮২.০৬ ভাগ। গত বছরের চাইতে এ বছর পাসের হার ১৭ ভাগ বেশী। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা হচ্ছে ১০ হাযার ৫২৬ জন। গত বছর ছিল ৬ হাযার ৮৮৯ জন। ২০০৪ সালে পাসের হার ছিল ৫৯.৪৪। এ বছর দাখিল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৪ হাযার ১৪ জন। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮০ হাযার ৫শ' ৫৫ জন। পাস করেছে ১ লাখ ৪৮ হাযার ১৮৬ জন।

ভোকেশনাল: এ বছর কারিগরি বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৬২.৮৮ শতাংশ। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮২৩৭৫ জন। পাস করেছে ৫১৮০১ জন। ছাত্রদের পাসের হার শতকরা ৬২.৬৭ এবং ছাত্রীদের পাসের হার শতকরা ৬৩.৩৭। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৫৭ জন।

বিদেশ

ব্রাজিলে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে

সঊদী আরবের মাসিক 'আল-মুস্তাকবাল আল-ইসলামী' পত্রিকার সূত্র মতে, ব্রাজিলের মোট জনসংখ্যা ১৪৫ মিলিয়ন বা সাড়ে ১৪ কোটি। মুসলমানদের সংখ্যা এক কোটি। এখানে ২৫টি মুসলিম সংগঠন কাজ করছে। সেখানকার একটি সংগঠন 'আবূ বকর ছিদ্দীক্ব' এর দাওয়াতী তৎপরতার কারণে ব্রাজিলে ৫ হাযারের মত যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছে। অন্য একটি সংগঠনের নেতা ডঃ আহমাদ ছফির বর্ণনা মতে ব্রাজিলের প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি বড় মসজিদ রয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৮৩৫ সালে আফ্রিকার একটি মুসলিম কাফেলা দেশটির বাহিয়া নামক স্থানে এসে বসতি গড়ে। শুরুতে তারা খৃষ্টানদের ভয়ে ধর্মীয় বিধি-বিধানের উপর পুরোমাত্রায় আমল করতে সক্ষম না হ'লেও পরবর্তীতে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। বর্তমানে ব্রাজিলের জনগণ ক্রমেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে।

[সৌজন্যে: মা'আরিফ, আযমগড়, ইউ.পি, ভারত, মে '০৮, পৃঃ ৩৮৯]

পৃথিবীর প্রথম স্বর্ণের পত্রিকা

'চায়না ফ্লোরিশিং পিরিয়ড' নামে চীনে পৃথিবীর প্রথম স্বর্ণের পত্রিকা বের হয়েছে। এ পর্যন্ত পত্রিকাটির দু'টি সংখ্যা বের হয়েছে। পত্রিকাটির একটি সংখ্যার ওযন ছিল ৫০০ গ্রাম, মূল্য ৮৩০০ ডলার। অন্যটির ওযন ২০০৫ গ্রাম, মূল্য ৩৫০০ ডলার।

[ঐ, পৃঃ ৩৯০]

ব্রিটেনে চার্চে যাওয়ার প্রবণতা কমছে

খৃষ্টান ধর্মের মুখপত্র 'ক্রিশ্চিয়ান রিপোর্ট' পত্রিকার এক সংবাদে বলা হয়েছে, ব্রিটেনে খৃষ্টান ধর্মানুরাগীদের সংখ্যা মুসলমান ধর্মানুরাগীদের তুলনায় কমে যাচ্ছে। পত্রিকাটির ভাষ্য মতে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০ সাল নাগাদ রবিবারের প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হবে ৬,৭৯,০০০ জন। পক্ষান্তরে ঐ সময়ে মসজিদে গমনকারী মুসলমানদের সংখ্যা হবে ৬,৮৩,০০০ জন।

[ঐ, পৃঃ ৩৯০]

ফ্রান্সে প্রতিবছর ৩৬০০ জন ইসলাম গ্রহণ করছে

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, দেশটিতে ইসলাম ধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং সেখানে এটি বর্তমানে দ্বিতীয় ধর্ম হিসাবে গণ্য হচ্ছে। সূত্র মতে, ফ্রান্সে প্রত্যেক বছর ৩৬০০ জন ইসলাম গ্রহণ করছে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাও খুবই কম। তারা ধর্মীয় বিধি-বিধান যেমন ছালাত ও ছিয়ামে অভ্যস্ত। ফ্রান্সের ৬৬% মুসলমান জীবনে কোনদিন একবারের জন্যও মদ পান করেননি। আগামী বছরগুলোতে সেখানকার ৫৫% মুসলমান হজ্জ আদায় করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ফ্রান্সের মুসলিম যুবকরা খুবই ধর্মপরায়ণ। এর ফলে ফ্রান্সে দ্রুত ইসলামের বিকাশ ঘটছে।

ম্যানিলার স্কুলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চালু

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার কায়াপুতে মুসলমানরা সংখ্যাধিক্য। সেকারণ সেখানকার প্রাদেশিক সরকার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রাইমারি ও হাইস্কুলে আরবী ভাষা ও ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। ৫টি স্কুলের ১০৪০

Contents

জন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের আরবী ভাষা ও ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য ১৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

[মা'আরিফ, এপ্রিল '০৮, পৃঃ ২৯৬]

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে টেলিফোনে আড়িপাতা বিল পাস

আদালতের অনুমতি ছাড়াই গোয়েন্দা সংস্থাকে যেকোন ব্যক্তির টেলিফোনে আড়িপাতার অনুমোদন দিয়ে গত ২০ জুন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে একটি বিল পাস হয়েছে। কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে ২৯৩-১২৯ ভোটে বিলটি পাস হয়। বিলটি পাসের ফলে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর গত ছয় বছর প্রেসিডেন্ট বুশের গোপন কাজে সহায়তাকারী টেলিফোন কোম্পানীগুলোর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো এ বিলের বিরোধিতা করেছে। তারা বলেছে, এ ধরনের গোপন কর্মসূচী বেআইনি। কারণ ১৯৭৮ সালের ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসেস এ্যাক্টকে (এফআইএসএ) পাশ কাটিয়ে বিলটি করা হয়েছে।

কার্বন নিঃসরণকারী দেশের শীর্ষে চীন

কারিগরি শিল্পে সমৃদ্ধ এশিয়ার বড় দেশ চীনকে সম্প্রতি পৃথিবী উষ্ণায়নের জন্য দায়ী বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে। নেদারল্যান্ডস এনভায়রনমেন্টাল এ্যাসেসমেন্ট এজেন্সির (পিবিএল) প্রতিবেদনে গত বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চীন ১৪ শতাংশ বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়। চীনের কয়লাচালিত বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পকে এ ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশের তালিকায় ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সারা বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনের আট শতাংশ উৎপাদন করে থাকে ভারত।

বিশ্বের শীর্ষ বিনিয়োগ আস্থার দেশ ডেনমার্ক

বিশ্বের ১২১টি দেশের উপর পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বিনিয়োগবান্ধব দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক। দ্বিতীয় আয়ারল্যান্ড, তৃতীয় ফিনল্যান্ড, চতুর্থ যুক্তরাষ্ট্র এবং ৫ম ব্রিটেন। ভারত রয়েছে ৬৪তম এবং চীন ৮১তম স্থানে। 'ফোরবেস' ম্যাগাজিন পরিচালিত এ জরিপে দেখা গেছে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতি এবং সরকার ও বাম জোটসমূহের মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণে দেশটিতে বিনিয়োগের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতে দুধ, খাদ্যশস্য, চা, ভোজ্যতেল এবং কয়েকটি পণ্যসহ খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে সেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে ১১ দশমিক ৪২ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

ব্রিটেনেও শরী'আহ আইন ভূমিকা রাখতে পারে

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের প্রবীণ বিচারক লর্ড ফিলিপস বলেছেন, ব্রিটেনের আইনি ব্যবস্থায় শরী'আহ আইন ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, সালিশিতে শরী'আহ আইনের নীতির প্রয়োগে বাধা থাকার কোন কারণ নেই। শরী'আহ হচ্ছে এমন কিছু বিধি-বিধান যার আওতায় মুসলমানরা তাদের জীবন যাপন করতে পারে। হোয়াইট চ্যাপেলের মুসলিম সেন্টারে লর্ড ফিলিপস বলেন, শরী'আহ আইন ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, শরী'আহ আইনের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যান্টারবারির আর্চ বিশপ ডঃ রোবান উইলিয়াম ভুল বোঝাবুঝির শিকার হন যখন তিনি বলেন, ব্রিটিশ মুসলমানরা শরী'আহ আইনের আওতায় চলতে পারেন। আর্চ বিশপ উইলিয়াম বলেছেন, শরী'আহ আইন ভূমিকা রাখতে পারে বৈবাহিক আইনে, অর্থনৈতিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণে এবং সংঘাত মীমাংসায়।

৬০ বছর পর চীন-তাইওয়ান বিমান চলাচল শুরু

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক পর বিরোধপূর্ণ চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে সংহতির নিদর্শনস্বরূপ গত ৪ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে সরাসরি বিমান চলাচল। চুক্তি অনুযায়ী এখন থেকে চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল করবে। তাইওয়ানে যেতে পারবে বেশীসংখ্যক চীনা পর্যটক। সরাসরি বিমান চলাচলের প্রথমেই চীনের সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ঐ দিন সকালে দক্ষিণ চীনের গুয়াংঝৌ বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে তাইওয়ানের তাইপের তাউয়ুয়ান বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে যাত্রীদের লালগালিচা সংবর্ধনা জানানো হয়। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালের পর থেকে নির্ধারিত কিছু ছুটির দিন ছাড়া চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল করেনি।

পশ্চিমবঙ্গে ক্যান্সার নিরাময়ে সাফল্য

ভারতের প্রাচীন আয়ুর্বেদ তথা মানবীয় ভোজ্য পদার্থকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে যে অসাধ্য সাধন করা যায়, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার (১৬০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭, ২২৭০-৫৩৭৮) নামের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-গবেষক প্রফেসর শিবাশঙ্কর ত্রিবেদী। সংস্থাটি গত প্রায় ৪০ বছর ধরে ক্যান্সার নিয়ে শুধু গবেষণাই করছে না, ক্যান্সার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে। শুধু কথা নয়, প্রাচীন আয়ুর্বেদকে আশ্রয় করে বিভিন্ন মানবীয় ভোজ্য পদার্থ থেকে তৈরী পোষক শক্তি সম্পন্ন ঐ ওষুধ খেয়ে ৫ ও ১০ এমনকি ১৫-২০ বছর দিব্যি ভাল আছেন দেশ ও বিদেশে এমন মানুষের সংখ্যা কয়েক হাযার। এদের প্রায় সবাইকেই 'লস্ট কেস' বলে বিভিন্ন ক্যান্সার হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

মিয়ানমার ও সোমালিয়া বিশ্বের শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ

বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে সোমালিয়া ও মিয়ানমার। তবে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং সুইডেন। ভারত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দুই ধাপ নেমে এখন ৭৮-এ দাঁড়িয়েছে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) পরিচালিত বিশ্বের ১৮০টি দেশে পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। দুর্নীতি বিস্তার সূচকে দেখা গেছে, পাকিস্তান দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ১৪০-এ অবস্থান করছে। তার পরেই রয়েছে ইরান (১৩৩), লিবিয়া (১৩৪) এবং নেপাল (১৩৫)। এশীয় অঞ্চলের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে ভুটান। এই দেশটির অবস্থান হচ্ছে ৪১। যুক্তরাষ্ট্র সূচক তালিকায় ২০-এ রয়েছে। এদিকে ১৩তম স্থানে রয়েছে জার্মানী, আয়ারল্যান্ড, জাপান এবং ফ্রান্স।

Contents

মুসলিম জাহান

মদীনা মুনাওয়ারাকে জ্ঞানের নগরী হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা

মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় পবিত্র নগরী মদীনাকে জ্ঞানের শহর হিসাবে ঢেলে সাজাতে এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি ডলারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক নলেজ ইকনমিক সিটি (কেইসি) ৪টি ধাপে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে বলে জানায়। এর প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয় ২০০5 সালের ডিসেম্বর মাসে বিদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করতে অয়েল পাওয়ার হাউজ তৈরীর মধ্য দিয়ে। প্রকল্পের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করবে সঊদী এ্যারাবিয়ান জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি (এসএজিআইএ)। বেসরকারী কিছু প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ পর্যায়ের হজ সংগঠনগুলোর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। সঊদী আরবে এ পর্যন্ত বড় ধরনের যেসব উন্নয়ন স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে তার সর্বশেষ সংযোজন এই কেইসি। এদের প্রথম প্রকল্পটি হ'ল কিং আব্দুল্লাহ ইকনমিক সিটি, যা পশ্চিম উপকূলের রাবিগে নির্মিত হচ্ছে। কেইসি মদীনাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি বিশেষ আবহ তৈরী করেছে।

ব্যতিক্রমী বাগিচা!

শারজা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কাতার এবং শারজায় দু'টি এমন বাগিচা তৈরী করা হবে যেখানে শুধু কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত চারাগাছ রোপণ করা হবে। এজন্য ওলামা ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। দোহায় অবস্থিত ইউনেস্কো দফতর এ বাগানের পরিচর্যা করবে।

[সৌজন্যে: মা'আরিফ, আযমগড়, ইউ.পি, ভারত, মে '০৮, পৃঃ ৩৮৮]

হজ্জ বিশ্বকোষ প্রণীত হচ্ছে

বাদশাহ আব্দুল আযীয মিউজিয়ামের সেক্রেটারী ফাহ্দ আস-সাম্মারীর তত্ত্বাবধানে হজ্জ ইনসাইক্লোপেডিয়া (বিশ্বকোষ) প্রণয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হ'তে যাচ্ছে। এই বিশ্বকোষে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হজ্জের উপর আলোকপাত করা হবে এবং হজ্জ সম্পাদনকালে ব্যবহৃত রাস্তাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও ছবি, নকশা প্রভৃতি জিনিস সংযোজিত হবে। এতে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং হাজীদের অভিজ্ঞতাও বিধৃত হবে।

[ঐ, পৃঃ ৩৮৯]

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হিজরতের রেকর্ড তৈরী

মদীনা মুনাওয়ারা রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ সেন্টারের গবেষকরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ধারণকৃত ছবির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরতের রেকর্ড তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। হিজরতের দলীল-দস্তাবিজ প্রস্তুত করতে আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে এবং সঊদী জিওলজিক্যাল সার্ভে বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরত সম্পর্কিত ঘটনার জরিপও এই সেন্টার পুনঃনিরীক্ষা করছে।

[মা'আরিফ, এপ্রিল '০৮, সংখ্যা ৪, পৃঃ ২৯৭-৯৮]

কুরআন মাজীদের আরবী-ইংরেজী অভিধান প্রকাশ

খাদিমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ চ্যাপ্টারের তত্ত্বাবধানে গবেষণারত ইসলামিক স্টাডিজ কুরআন মাজীদের শব্দসমূহের আরবী-ইংরেজী অভিধান তৈরী করেছে। এ প্রকল্পের পরিচালক ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম জানান, দীর্ঘ ৫ বছরের গবেষণার ফসল এটি। হল্যান্ডের নামকরা প্রকাশনা সংস্থা থেকে এটি প্রকাশ করানো হয়েছে। এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে শব্দ ও অর্থ এবং পূর্বাপর যোগসূত্র উল্লেখসহ বাক্যের মর্ম বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া কুরআনে বর্ণিত স্থান ও ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও এতে পেশ করা হয়েছে। *[ঐ, পৃঃ ২৯৬]*

বিশ্বের প্রথম ঘূর্ণায়মান উঁচু ভবন নির্মিত হচ্ছে দুবাইয়ে

সামনে পারস্য উপসাগর। সেদিকে তাকাতে তাকাতে চোখের সামনে চলে আসে খোলা আকাশ। বায়োস্কোপের দৃশ্য নয় এটি। বাস্তবেই দুবাইয়ে নির্মিত হচ্ছে এমন একটি ঘূর্ণায়মান ভবন, যা থেকে দেখা যাবে এ দৃশ্য। ডেভিড ফিশার নামে ইতালির এক স্থাপত্যশিল্পী এ ভবন নির্মাণ করবেন। তিনি জানান, এটি হবে বিশ্বের প্রথম ঘূর্ণায়মান উঁচু ভবন। ভবনটি হবে ৮০ তলার। প্রতিটি তলা ঘোরার কারণে একেক সময় এর আকার হবে একেক রকম। ভবনের মাঝখানে তৈরী সিমেন্টের একটি স্থির পিলারের চারপাশে তলাগুলো রিংয়ের মতো ঘুরতে থাকবে। প্রতিটি তলার মধ্যে বসানো হবে বাতাসের বৃহৎ টার্বাইন। এর মাধ্যমে পুরো ভবনের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এছাড়া লিফটের মাধ্যমে প্রতিটি তলার বাশিন্দার গাড়ী পৌঁছে যাবে সংশ্লিষ্ট তলায়। ভবনের বেশ কিছু তলা ঘুরবে কণ্ঠনিয়ন্ত্রত কম্পিউটারের নির্দেশে। বাকী তলাগুলো ঘুরবে আগে থেকে নির্ধারিত নির্দেশনা অনুযায়ী।

আফগানিস্তানে বেসামরিক লোকের প্রাণহানি বেড়েছে ৬২ ভাগ

আফগানিস্তানে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংঘর্ষে নিহত বেসামরিক নাগরিকদের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ বেড়ে চলতি বছরের প্রথমার্ধে এটি প্রায় ৭শ' জনে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের শীর্ষ মানবাধিকার কর্মকর্তা হোলসেম এ তথ্য দেন। হোলসেম জাতিসংঘের তালিকা উল্লেখ করে বলেন, চলতি বছরের প্রথমার্ধে সংঘর্ষ ও হামলায় ৬৯৮ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়। গত বছরের প্রথমার্ধে সংখ্যাটি ছিল ৪৩০ জন। এখন তা ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় সরকারবিরোধী গ্রুপগুলোর হাতে মারা গেছে ৪২২ জন, যা মোট সংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ। অন্যদিকে সরকার ও বিদেশী সৈন্যরা হত্যা করেছে ২৫৫ জন নিরীহ আফগানকে। প্রাণ হারানো অপর ২১ জনের মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

পবিত্র কা'বা শরীফ ও মসজিদে নববীর ছবি তোলা যাবে না

পবিত্র কা'বা শরীফ ও মসজিদে নববীর ছবি তোলা বা ভিডিও করা যাবে না। পবিত্র কা'বা শরীফ ও মসজিদে নববীর আদব রক্ষা এবং হাজীদের ইবাদত-বন্দেগীতে বিঘ্ন ঘটায় সঊদী সরকার এ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। সঊদী আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ডঃ ফুওয়াদ বিন আব্দুস সালাম আল-ফারেসী সম্প্রতি এক আদেশে আল-হারামাইন আশ-শরীফাইনের ভেতর বা বাইরে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রওযার ভেতর বা বাইরে যে কোন ধরনের ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করা এবং ছবি তোলা, ভিডিও ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ছবি না তোলার জন্য হজ্জযাত্রী এবং ওমরা পালনকারীদেরকে নিষেধ করেছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দেড় লিটার পানি দিয়ে ৯শ' কিলোমিটার গাড়ী চালানো যাবে!

দেড় লিটার পানি দিয়ে ৯শ' কিলোমিটার গাড়ী চালানো যাবে। এতে ১ লিটার জ্বালানি তেলের মাত্র ৫ শতাংশ খরচ হবে। 'কমপ্রেসড ওয়াটার' নামে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির উদ্ভাবক মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন জসিম গত ১৪ জুলাই বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। দীর্ঘ চার বছর গবেষণার পর তিনি এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। এতে জ্বালানি তেলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাইওয়েতে ইঞ্জিনচালিত সকল যানবাহন থেকে শুরু করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ৭৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ জ্বালানি তেল সাশ্রয় হবে। এ প্রযুক্তির ব্যবহৃত গাড়ির গতি ৬০ শতাংশ বেড়ে যাবে। এর উৎপাদিত প্রধান শক্তি ও উৎস একমাত্র পানি। জয়নাল আবেদীন নতুন প্রযুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, হাইড্রোজেন একটি বিস্ফোরক। পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিদ্যমান। এ প্রযুক্তির মূল সূত্র হ'ল পানি থেকে অক্সিজেন বের করে হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা। এতে হাইড্রোজেনের পাশাপাশি ১০ থেকে ২০ ভাগ জ্বালানি তেল ব্যবহার হবে। ১০ থেকে ১২ হাযার টাকায় গাড়ীতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে।

চাউলের দানার মত মেমোরি চিপ আবিষ্কার

কম্পিউটার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী কোম্পানী হেভেল্ট পেকার্ড চাউলের দানার মত একটি মেমোরি চিপ তৈরী করেছে। এতে একশ পৃষ্ঠার মত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা যাবে। চিপের আকার ২ থেকে ৪ বর্গমিলিমিটার। ভবিষ্যতে এতে আরো বেশী ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ চিপটিকে যেকোন ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা যাবে। ভবিষ্যতে ভেজাল ঔধুধ শনাক্তকরণ এবং রোগ নির্ণয় প্রভৃতি কাজে এটিকে ব্যবহার করা হবে। ১০০ মেগাবাইট ডাটা সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করার জন্য এতে মাত্র দশ সেকেন্ড সময় লাগবে।

[মা'আরিফ, এপ্রিল '০৮, পৃঃ ২৯৮]

ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা আগেই পূর্বাভাস জানা যাবে

বিজ্ঞানীদের নতুন একটি আবিষ্কার ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পদ্ধতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, কোন স্থানে ভূমিকম্প হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই ঐ অঞ্চলে কিছু ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার সান আন্দ্রিসের ভূ-স্তরের ফাটল নিয়ে গবেষণার সময় বিজ্ঞানীরা এমনটি দেখতে পান। এ গবেষণা থেকে দেখা যায়, অন্তত দুই থেকে ১০ ঘণ্টা আগে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

ফাটল এলাকায় বসানো যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, ভূমিকম্প পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌছানোর আগে শিলাস্তরে ছোট ছোট ফাটলের সৃষ্টি হয়। তবে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্রের মতো নিয়মিত পূর্বাভাস দেওয়া এখনই সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, 'নিয়মিত ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার মতো পদ্ধতি আবিষ্কার থেকে আমরা এখনো বেশ দূরেই আছি। তবে সর্বশেষ এই আবিষ্কার বলে দিচ্ছে, একদিন এ ধরনের পূর্বাভাস পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে'। বিজ্ঞানী পল সিলভারের মতে, ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যেই এটি সম্ভব হ'তে পারে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে ভূমিকম্প সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়ার যে পদ্ধতি রয়েছে, তাতে খুব বেশী হ'লে ভূমিকম্প আঘাত হানার কয়েক সেকেন্ড আগে ভূমিকম্পটি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।

বৈশ্বিক উষ্ণতা কিডনিতে পাথর সমস্যা বাড়াতে পারে

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আগামী বছরগুলোতে আরো আমেরিকান কিডনিতে পাথর সমস্যায় ভুগতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একথা জানান। পানিশূন্যতা, পর্যাপ্ত তরল পদার্থ পান না করা বা অত্যধিক গরমের কারণে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি বের হয়ে যাওয়ায় কিডনিতে পাথর হয়ে থাকে। ২০০৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে জাতিসংঘ আন্তঃসরকারী প্যানেল জানায়, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের শুষ্ক এলাকাগুলোতে কিডনিতে পাথর সমস্যা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশংকা রয়েছে।

মঙ্গলের মাটি সবজি চাষের উপযোগী

নাসার একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, উদ্ভিদ ও সবজি জাতীয় অ্যাসপারাগাস তৈরীতে মঙ্গলের মাটি যথেষ্ট উপযোগী। মঙ্গলে অবতরণকারী মার্কিন মহাকাশযান ফিনিক্স মার্সের সংগ্রহ করা মাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে গত ২৬ জুন বিজ্ঞানীরা ওয়াশিংটনে এই ঘোষণা দেন। প্রকল্পের প্রধান কেমিস্ট আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল কোনাভেস বলেন, প্রাণী জগতের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন উপাদান মঙ্গলের মাটিতে নেই; বরং সত্য হ'ল এই যে, তা অত্যন্ত বন্ধুসুলভ মনে হয়েছে। তিনি বলেন, এখানে যে মাটি আমরা দেখছি তা বাড়ীর পেছনের উঠানের মতো মনে হ'তে পারে এবং খুব ভালভাবে সবজি চাষ করা যেতে পারে। মহাকাশযানের রোবটিক হাতের সংগ্রহ করা এক ঘনসেন্টিমিটার মাটিতে বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

সুনিদ্রায় স্মরণশক্তি বাড়ে

সুনিদ্রায় স্মরণশক্তি বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, রাতে খুব ভাল ঘুম হ'লে তা স্মরণশক্তি বাড়ানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হ'তে পারে। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ নিয়ে গবেষণা করেন। এতে গবেষকরা দেখতে পান, রাতে গভীর ঘুম হ'লে মস্তিষ্কের পরের দিনের কর্মকাণ্ডের উপর তা নাটকীয় সুফল বয়ে আনে। প্রধান গবেষক ডঃ সোফি শওয়ার্টজ বলেন, ঘুম মস্তিষ্ক ও দুর্বল স্মরণশক্তিকে পুষ্ট অভিজ্ঞতায় শক্তিশালী করে তোলে।

স্টিলের মতো মজবুত কাগজ!

কাগজে লিখে রাখা নাম কালের আবর্তে মুছেই যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নতুন যে কাগজ তৈরী করেছেন, তা বোধহয় চিরকালই টিকে থাকবে। সুইডেনে প্রাকৃতিক সেলুলোজ ন্যানোফাইবার থেকে তৈরী 'ন্যানোপেপার' নামের একটি কাগজ উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা স্টিলের মতোই মজবুত। প্রচলিত কাগজের আঁশের চেয়ে এই সেলুলোজ ফাইবার অনেক ছোট। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এর চাপ সইবার ক্ষমতা ২১৪ মেগাপ্যাসকেল, যা ঢালাই লোহার (১৩০ মেগাপ্যাসকেল) চেয়ে বেশী এবং ভবন ও সেতুতে ব্যবহৃত ইস্পাতের (২৫০ মেগাপ্যাসকেল) কাছাকাছি। প্রচলিত কাগজের চাপ সইবার ক্ষমতা এক মেগাপ্যাসকেলেরও কম।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

আন্ধার মোহা, দিনাজপুর ২৭ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ দিনাজপুর যেলার চিরির বন্দর থানার অন্তর্গত আন্ধার মোহা শাখার উদ্যোগে আন্ধার মোহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আফসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুর রায্যাক, সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা তৈয়ব আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত ও তাবলীগে অংশগ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান।

নশিপুর, বগুড়া ৪ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে নশিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মোখলেছুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মালেক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নির্ভেজাল সমাজ গঠনে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। তিনি সমাজে পুঞ্জিভূত শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীকরণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াত ও তাবলীগে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ১০ ও ১১ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ যেলার সোনারগাঁও-এর অন্তর্গত আমগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ১০ ও ১১ জুলাই ২ দিন ব্যাপী মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন বাদ মাগরিব এবং দ্বিতীয় দিন বাদ আছর অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঢাকার বংশাল, নাজিরা বাজার, সুরিটোলা মালিটোলা ও বাংলাদুয়ার সহ বিভিন্ন মহল্লা থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী ১টি রিজার্ভ বাসযোগে উক্ত তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা ফযলুল হক্ব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল আলীম আল-আসাদ, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ, নাজিরা বাজার শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ শফীকুদ্দীন, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, আমগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান, হাতুরাপাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীরুযযামান, লস্করবাড়ী জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ হুযাইফা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আর অল্পদিন পরেই আমাদের নিকট সমাগত হবে পবিত্র মাহে রামাযান। পবিত্র কুরআন নাযিলের এই মাসে আমাদেরকে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত সহ অন্যান্য ইবাদত করতে হবে। বিরত থাকতে হবে যাবতীয় অন্যায়, অশ্লীলতা, অপকর্ম ও পাপাচার থেকে। তাহ'লেই আমরা মুত্তাক্বী হ'তে পারব। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তি দাবী করেন।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

ফুলতলা, পঞ্চগড় ২৬ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে স্থানীয় ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুন নূর, যেলা কর্মপরিষদ সদস্য নাছীরুদ্দীন ও তাযীমুদ্দীন প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ দেড় বছর দেশে যরূরী অবস্থা বলবৎ থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালানো সম্ভব হয়নি। এখন যরূরী অবস্থা শিথিল হওয়ায় সংগঠনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে আর বাধা নেই। তিনি দ্রুত যেলার বিভিন্ন শাখা পুনর্গঠন করে সংগঠনকে সচল করার আহ্বান জানান। তিনি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

আন্ধার মোহা, দিনাজপুর ২৭ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চিরির বন্দর থানাধীন আন্ধার মোহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন

Contents

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আফসার আলী, মুহাম্মাদ হেলালুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুর রায্যাক প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সাংগঠনের অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য শীঘ্রই যেলার সর্বস্তরের কমিটি পুনর্গঠন করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

নশিপুর, বগুড়া ৪ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বেলা আড়াইটায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে নশিপুর আল-মারকাযুল ইসলামী মিলনায়তনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সহকারী প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ বাবলু মিয়া প্রমুখ। প্রধান অতিথি গঠনতান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে সংগঠনকে আরো গতিশীল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মসজিদ উদ্বোধন

আশাশুনি, সাতক্ষীরা ১৩ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ আশাশুনি উপযেলার নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের নবনির্মিত ভবনে জুম'আর ছালাত উদ্বোধন উপলক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নয়াপাড়া এলাকার যৌথ উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সম্মানিত উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অতঃপর ছালাতান্তে এলাকা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা হাবীবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা আইনজীবী পরিষদের আহ্বায়ক এডভোকেট যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

আলোচনা সভা

বুড়িচং, কুমিল্লা ২৭ জুলাই রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে বুড়িচংস্থ যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রুসমত আলী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মাওলানা যয়নাল আবেদীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হান্নান, দফতর সম্পাদক মাওলানা শামসুল হক্ব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইসলামুদ্দীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক কাউছার আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বিনা বিচারে ডঃ গালিবের উপর কারা নির্যাতনে তিন কোটি আহলেহাদীছসহ সচেতন মুসলিম সমাজে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এভাবে নিরপরাধ মানুষকে হয়রানির পরিণাম বিগত সরকার মনে হয় অনেকটা বুঝতে পেরেছে। তিনি অবিলম্বে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলাসমূহ প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান। সেই সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র চলছে তা থেকে সতর্ক থাকার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ আমীরে জামা'আতের মুক্তির প্রশ্নে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও দো'আর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও কর্মী সমাবেশ

মুজিবনগর, মেহেরপুর ৩০ মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার কর্মী ও সুধীদের সমন্বয়ে রিজার্ভ বাসযোগে মেহেরপুর যেলার মুজিবনগরে আগত শিক্ষা সফরকারী এবং স্বাগতিক যেলার কর্মী ও সুধীদের নিয়ে গোপালনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, যেলা আইনজীবী পরিষদের আহ্বায়ক এডভোকেট যিল্লুর রহমান, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ।

উপস্থিত সুধীজনের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রধান অতিথি তাঁর কারাজীবনের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দেন। এতে সকলে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। সাথে সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** আশু কারামুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করেন।

Contents

ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা ৮ জুন রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর দক্ষিণ পাথরঘাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝাউডাঙ্গা এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গোলাম সারওয়ার, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফ্ফর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন অহি ভিত্তিক একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। পরকালীন মুক্তিই এর প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য। তিনি উপস্থিত ছাত্র, কর্মী ও সুধীবৃন্দকে দুনিয়াবী নয়; বরং পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মানব রচিত সকল মতবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছে আত্মসমর্পণের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তি এবং তাঁর সুস্বাস্থ্যের জন্য দো'আ কামনা করে আলোচনা শেষ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ঝাউডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা, ঝাউডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ, সাতক্ষীরা সিটি কলেজ, কলারোয়া আলিয়া মাদরাসার বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৯ জুন সোমবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় সোনাবাড়িয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সোনাবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গফূর, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গোলাম সারওয়ার, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফ্ফর রহমান, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুত্তালিব প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কথিত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মত কেউ এত স্পষ্ট ও জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন বা লেখনী প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ সেই মিথ্যা অপবাদেই তাঁকে কারাবরণ করতে হচ্ছে। এটা নিছক ষড়যন্ত্র। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সম্পূর্ণ নির্দোষ অবস্থায় সম্মানজনকভাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ।

বংশাল, ঢাকা ৯ জুলাই বুধবারঃ অদ্য আছর ফজর বংশালস্থ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে এক যুব সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব ও দফতর সম্পাদক মুহসিন আকন্দ প্রমুখ। সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন, নির্দোষ আলেমে দ্বীন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এদেশের অহংকার। মিথ্যা মামলায় তাঁকে এমন হয়রানি মানবতার চরম অপমান। তিনি আমীরে জামা'আতের মুক্তির ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার যরূরী হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ১৮ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেশরহাট এলাকার উদ্যোগে সিংহমারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাজরাপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আবুল হুসাইন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যত। সুশিক্ষিত আদর্শবান ছাত্ররাই জাতির কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদেরকে শিক্ষিত হয়ে দেশ, জাতি ও ইসলামের কল্যাণে নিবেদিত হ'তে হবে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে 'উত্তম জাতি' হিসাবে সৃষ্টি করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সংঘবদ্ধভাবে এ পবিত্র আমানত পালনের জন্য আমাদেরকে 'যুবসংঘ'-এর পতাকা তলে একতাবদ্ধ হ'তে হবে। আমরা যদি জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন না করি তাহ'লে বিপথগামী হব। তিনি ছাত্রদেরকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার উদাত্ত আহ্বান জানান। সমাবেশে আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, কেশরহাট ডিগ্রী কলেজ, শ্যামপুরহাট ডিগ্রী কলেজ, কেশরহাট কারিগরি কলেজ, সাকোঁয়া-বাকশৈল কামিল মাদরাসা, মোহনপুর আলিয়া মাদরাসা, মোহনপুর সরকারী উচ্চবিদ্যালয় ও বাকশিমুইল উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সাঁকোয়া-বাকশৈল কামিল মাদরাসার ৮ম শ্রেণীর ছাত্র হাফেয সেলিম। উল্লেখ্য, সমাবেশ শেষে উক্ত মসজিদে কেন্দ্রীয় সভাপতি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

বংশাল, ঢাকা ২৫ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

Contents

মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলা 'যুবসংঘ' কার্যালয় মিলনায়তনে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরবের দাম্মাম শাখা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র সদস্য মাওলানা মুনীরুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

'উত্তম চরিত্র গঠনে ইসলামের অবদান' শীর্ষক আলোচনা সভা ও মাসিক ইজতেমায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পৃথিবীতে যত আদর্শ আছে তার মধ্যে ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর উত্তম চরিত্র গঠনে ইসলামের অবদানই সবচেয়ে বেশী এবং ইসলামই বিশ্বমানবতার মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। তিনি বলেন, উত্তম চরিত্র মানুষকে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকি মুক্তি দিতে পারে। মানুষ ইসলামের নির্দেশ মেনেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হ'তে পারে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ, নাজিরা বাজার শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুস সুবহান, বায়তুল মামূর জামে মসজিদের ইমাম হাফেয মাওলানা মাহমূদুল হাসান প্রমুখ। উক্ত ইজতেমায় মহিলাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলার সভানেত্রী নাজনীন আইয়ুব, সাধারণ সম্পাদিকা নাইমুন নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদিকা রেহেনা পারভীন, অর্থ সম্পাদিকা জেবা রহমান, তাবলীগ সম্পাদিকা সায়েরা আতিক, প্রশিক্ষণ সম্পাদিকা জাহেদা বেগম ও সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা রাবিয়া বেগম প্রমুখ। উল্লেখ্য, ঢাকার বংশাল, নাজিরা বাজার, বাংলাদুয়ার, সুরিটোলা ও মালিটোলাসহ বিভিন্ন মহল্লা থেকে প্রায় দু'শতাধিক পুরুষ ও মহিলা উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলাদের বসার পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

২০০৮ সালের দাখিল ও এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা

সাতক্ষীরা ১৯ জুলাই শনিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে যেলার আব্দুর রায্যাক পার্ক সংলগ্ন সাতক্ষীরা পৌর অডিটোরিয়ামে ২০০৮ সালের দাখিল ও এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি রাজশাহীর লেকচারার ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর এম.এম. কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর নযরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির ভাষণে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 'আত-তাহরীক' সম্পাদক বলেন, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত কখনো সুশিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। যে শিক্ষা মানুষকে স্বীয় প্রভু থেকে গাফেল রাখে, সে শিক্ষা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের শিক্ষা সংস্কারের কথা উল্লেখ করে সরকারের নিকট তা বাস্তবায়নের দাবী জানান। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বিগত সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের সিনিয়র **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবী করে বলেন, তাঁর মত একজন খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদকে বিনা অপরাধে আটক রেখে কখনো সুশাসন কল্পনা করা যায় না। এর মাধ্যমে সুশাসনকে চূড়ান্তভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। দেশে বিরাজমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সহ বর্তমান হাহাকার অবস্থার জন্য তিনি সরকারের কৃতকর্ম ও আলেম-ওলামার উপর অন্যায় যুলুম-নির্যাতনকে দায়ী করেন। সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, কর্মী ও সুধী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্বরূপ উপস্থিত প্রায় একশত কৃতী ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহসান হাবীব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গফূর, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, অর্থ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাঃ এস.এম. ইসরাঈল, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব আযীযুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল মুহাম্মাদ মহীদুল ইসলাম, আহলেহাদীছ আইনজীবি পরিষদ সাতক্ষীরা যেলার আহ্বায়ক এডভোকেট যিল্লুর রহমান, সদর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, বুধহাটা এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন, সদর এলাকার সভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান, বাঁশদহা এলাকার সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া থেকে গোল্ডেন 'এ প্লাস' প্রাপ্ত ছাত্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুর রহীম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন বুরহানুদ্দীন।

উল্লেখ্য যে, সকাল ১০-টা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উত্তীর্ণ দশ

Contents

জন অনুমোদিত কর্মীকে শপথবাক্য পাঠ করান। বাদ মাগরিব তিনি স্থানীয় বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'দৃষ্টিপাত' এর সম্পাদক জি.এম. নূর ইসলাম এবং 'পত্রদূত' পত্রিকার সম্পাদক এডভোকেট আবুল কালাম আযাদ-এর সাথে স্ব স্ব দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন ও মত বিনিময় করেন। এ সময়ে এটিএন বাংলা সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ক্বামারুযযামান ও দৈনিক প্রথম আলো সাতক্ষীরা প্রতিনিধি কল্যাণ ব্যানার্জীর সাথেও মতবিনিময় করেন।

মহিলা সংস্থা

বংশাল, ঢাকা ২৭ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা 'যুবসংঘ' কার্যালয়ে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার তাবলীগ সম্পাদক ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মা-বোনদের কর্তব্য হ'ল ইসলামী জীবন-যাপন করা এবং স্বামীর হক্ব আদায় করা। স্বামীর হক্ব বলতে স্বামী যখন স্ত্রীকে শরী'আত সম্মত আদেশ-নিষেধ করবেন, তখন তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তেমনি স্বামীর নিকট স্ত্রীর হক্ব হ'ল স্বামী সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ করবেন। সাথে সাথে স্ত্রীকে বিশেষভাবে ইসলামী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ, নাজিরা বাজার শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন ঢাকার নয়াবাজারস্থ বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেয মাহমূদুল হাসান।

বাঁকাল সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় বাঁকাল মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া বাঁকাল, সাতক্ষীরার ছাত্ররা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এ বছর দাখিল পরীক্ষায় উক্ত মাদরাসা থেকে ১১ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫ জন জিপিএ-৫ (এ+), ৫ জন 'এ' এবং ১ জন 'এ-' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে ১ জন গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

(ক) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের পিতা এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার অন্যতম সুধী ডাঃ মুহাম্মাদ রায়হানুদ্দীন মাস্টার (৭৭) ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ ৭ মাস যাবৎ অসুস্থ থাকার পর গত ৮ জুলাই বিকাল সাড়ে ৫-টায় রসূলপুরস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন ৯ জুলাই সকাল ৯-টায় রসূলপুর হাইস্কুল মাঠে জানাযা শেষে রসূলপুর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার চতুর্থ পুত্র মাওলানা আলতাফ হোসাইন। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর সেক্রেটারী মাওলানা ওবায়দুল্লাহ গযনফর প্রমুখ। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা, কর্মপরিষদ ও সর্বস্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ জানাযায় উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয় প্রায় সহস্রাধিক মুছল্লী জানাযায় শরীক হন।

উল্লেখ্য, মৃত্যুরপূর্বে ডাঃ রায়হানের আকাংখা ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির খবর শুনা। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হ'ল না। জীবদ্দশায় তিনি জানান যে, তিনি আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের পর কোন ছালাতেই তাঁর মুক্তির জন্য দো'আ করতে ভুলেননি'।

(খ) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর-এর একমাত্র পুত্র মুহাম্মাদ ছাদিক রায়হান দুরারোগ্য ব্যাধি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২০ জুলাই ২০০৮ ইং তারিখে দিবাগত রাত ১-টা ৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র (২ মাস), পিতা-মাতা, দুই বোন ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন ২১ জুলাই বাদ যোহর স্থানীয় তালিমুল মিল্লাত মাদ্রাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। তাকে বসুপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদীর, যেলা সহ-সভাপতি মুযযাম্মিল হক্ব, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইদরীস আলী খান, জনাব বদরুল আনাম, মসজিদের সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলী, পেশ ইমাম মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও স্থানীয় বিপুল সংখ্যক মুছল্লী। ছাদিক রায়হান আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। আমীরে জামা'আতের মামলার অগ্রগতি ও তাঁর মুক্তির ব্যাপারে প্রায়ই খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও বিগত তাবলীগী ইজতেমা ও ঢাকার সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন। সেই সাথে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

আত-তাহরীক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

॥ আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ॥

সম্মানিত পাঠক! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র আপনাদের প্রিয় গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'** অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১১তম বর্ষ অতিক্রম করে ১১তম সংখ্যায় পদার্পণ করেছে। আমাদের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আপনাদের সহযোগিতাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত এই অনন্য মুখপত্রটি সেপ্টেম্বর ১৯৯৭-এর সূচনালগ্ন থেকেই বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবেষ্টিত মানবতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে মাইলফলক হিসাবে কাজ করে আসছে। দেশ-বিদেশে সাড়াও পেয়েছে আশানুরূপ। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাভাষী মুসলমানদের নিকটে এমন একটি পত্রিকা ছিল দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যৎসামান্য হ'লেও চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছি। ফালিল্লা-হিল হামদ।

প্রিয় পাঠক! আমরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি পত্রিকাটির মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে। সেকারণ দীর্ঘ ১১ বছরে অসংখ্যবার কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও পাঠকদের কথা সুবিবেচনা করে আমরা মাত্র ২ বার মূল্যবৃদ্ধি করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, সম্প্রতি কাগজের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা পত্রিকাটির বর্তমান মূল্য ১৪/= টাকার পরিবর্তে আগামী সেপ্টেম্বর '০৮ সংখ্যা থেকে ২ (দুই) টাকা বৃদ্ধি করে ১৬/= টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। যেমনটি অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আমরা জানি এই মূল্যবৃদ্ধি আপনাদের কাম্য নয়। কিন্তু 'দ্বীনে হক্ব' প্রচারের এই নির্ভরযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী মুখপত্রটি বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এর কোন বিকল্প ছিল না। আশা করি দ্রব্যমূল্যের অনাকাঙ্খিত ঊর্ধ্বগতির এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনাদের প্রিয় 'আত-তাহরীক'-এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধি কষ্টের কারণ হবে না। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতাই উন্মোচিত করবে আমাদের সাফল্যের দ্বার। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীন অনুযায়ী চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১)ঃ আমাদের গ্রামের একটি অবিবাহিত মেয়ে অন্তঃসত্তা হয়। আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে জানা যায়, তার পেটে পাঁচ মাস বয়সের বাচ্চা রয়েছে। মেয়েটি একটি ছেলের প্রতি এ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। কিন্তু অভিযুক্ত ছেলেটি ব্যভিচারের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও কেবল মেয়ের দাবীর উপর ভিত্তি করে স্থানীয় লোকজন জোর করে ঐ ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিবাহ পড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় এ বিবাহ বৈধ হবে কি? দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফ আলী মণ্ডল
কোদালকাটি (জেলেপাড়া)
আলাতুলি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কেবলমাত্র উক্ত মহিলার দাবীর উপর ভিত্তি করে ছেলেটি দোষী সাব্যস্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে চার জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য প্রদান না করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে তলব কর' *(নিসা ১৫)*। যদি ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়, তাহ'লে তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না এবং তার সাথে জবরদস্তি করে বিবাহও দেওয়া যাবে না। সূরা নূরের ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, কোন সৎ পুরুষের যিনাকারিণী মহিলাকে বিবাহ করা এবং সতী মহিলার যিনাকারী পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৪)*। সেকারণ প্রমাণহীনভাবে জোর-জবরদস্তী করে বিবাহ পড়িয়ে দেওয়া শরী'আত সম্মত হয়নি *(ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৫)*। অপরদিকে মহিলা যেহেতু স্বীকার করেছে এবং তার গর্ভাবস্থা সেটা প্রমাণ করছে, সেহেতু তার উপর হদ্দ জারী করতে হবে। উল্লেখ্য যে, অবিবাহিত যিনাকারিণীর হদ্দ ১০০ বেত্রাঘাত। অনুরূপভাবে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে, তার শাস্তিও প্রয়োগ করতে হবে। আর মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি হচ্ছে ৮০ বেত্রাঘাত *(নূর ৫)*। উল্লেখ্য, শরী'আত নির্ধারিত হদ্দ কেবলমাত্র সরকার বা তার প্রতিনিধি জারী করবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ৫-৭)*। অতএব প্রশ্নের বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, উক্ত বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তি যেনাকারী না হ'লে এ বিবাহ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (২/৪০২)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, তারাবীহ, জুম'আ ও ঈদের ছালাতের বিনিময়ে ইমাম ছাহেবকে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ প্রদান করা যায় কি?

-নূরুল ইসলাম
জয়পুরহাট কলেজ, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় আমল সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করেননি *(ফুরক্বান ৫৭)*। কিন্তু যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী তারা প্রয়োজনমত সম্মানীভাতা নিতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন সে যেন বিরত থাকে এবং যে মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' *(নিসা ৬)*। অবশ্য ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হ'লে তার সম্মানজনক রূযীর ব্যবস্থা করা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণেরই কর্তব্য। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয় তাহ'লে তা খেয়ানত হবে' *(আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, হা/৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অনুচ্ছেদ)*। মোটকথা, কোন ধর্মীয় কাজের বিনিময় আদায়ে দরাদরি করা অনুচিত। তবে সরকার বা সমাজকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা সমুন্নত রেখে সর্বোত্তম সম্মানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দ্বীন পরাজিত ও বিপর্যস্ত হবে এবং বাতিল অগ্রগতি লাভ করবে।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩)ঃ কত সময় পর্যন্ত ইফতার করা যেতে পারে? অনেক সময় দেখা যায়, ইফতার খেতে খেতে মাগরিবের ছালাত আদায়ে বিলম্ব হয়ে যায়। এরূপ বিলম্ব করা কি ঠিক?

-হাফেয আল-আমীন
হুলিখালি, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে বলেছেন। (১) তাড়াতাড়ি ইফতার করা *(বুখারী হা/২৬২)* এবং (২) তাড়াতাড়ি মাগরিবের ছালাত আদায় করা *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৬০৯)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মাগরিব ছালাতের আগে কয়েকটি তাজা খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে

শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও না থাকলে কয়েক অঞ্জলি পানি পান করে নিতেন' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯১)*। অতএব মাগরিবের ছালাত বিলম্ব করে দীর্ঘ সময় ধরে ইফতার খাওয়া উচিত নয়। বরং ইফতারী সংক্ষিপ্ত করে যথাসম্ভব দ্রুত ছালাত আদায় করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪)ঃ সাহারীর আযান সম্পর্কে কিছুসংখ্যক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেন যে, রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এবং তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে হবে। এ দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উপরোক্ত দাবী যথার্থ নয়। রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এমনটি সঠিক নয়। তবে স্বর্ণযুগে অধিকাংশ ছাহাবী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন বিধায় তখন সারা বছর সাহারীর আযান চালু ছিল *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮২)*। অনুরূপভাবে বর্তমানেও কোথাও নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত থাকলে আযান দেওয়া যাবে। যেমনভাবে মক্কা-মদীনায় এখনো উক্ত আযান চালু রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আযান সাহারী কিংবা তাহাজ্জুদ কোন একটির সাথে খাছ নয়। বরং উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫)ঃ আমরা শুনে থাকি যে, পবিত্র মাহে রামাযানের শেষ দশদিন কাউকে না কাউকে ই'তেকাফে বসতেই হবে। আমার প্রশ্ন হ'ল, কোন সমাজের একজন ব্যক্তিও যদি ই'তেকাফে না বসে, সেক্ষেত্রে সমাজের সকলেই কি গুনাহগার হবে?

-আহমাদ
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন সমাজের কেউ ই'তেকাফ না করলে সকলে গোনাহগার হবে মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ই'তেকাফ পালন করা ওয়াজিবও নয়, ফরযও নয়। বরং তা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পালন করবে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে, কিন্তু পালন না করলে গুনাহগার হবে না; বরং উক্ত আমলের ছওয়াব হ'তে বঞ্চিত হবে মাত্র *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬)ঃ শা'বান মাসের শুরু থেকে রামাযানের পূর্ব পর্যন্ত একটানা ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আমানুল্লাহ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালনে সক্ষম এবং রামাযান মাসের ছিয়াম পালনে যাদের কোন কষ্ট হবে না, সেসব ব্যক্তি পূর্ণ শা'বান মাস ছিয়াম পালন করতে পারেন। ১৫ শা'বানের পর ছিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীছটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করলে অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়বে এবং রামাযানের ছিয়াম পালনে অক্ষম হওয়ার আশংকা থাকবে *(মির'আত, পৃঃ ৪৪০-৪৪১)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭)ঃ তারাবীহর জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহর জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?

-জসীমুদ্দীন সরকার
নবিয়াবাদ, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায়। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং ওটা তার জন্য নফল ছালাত হিসাবে গণ্য হ'ত *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৫১)*। অতএব এশার নিয়তে কেউ তারাবীহর জামা'আতে শামিল হ'লে তার এশার ছালাত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বাকী ছালাত ইমাম সালাম ফিরানোর পর পড়ে নিবে।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮)ঃ ট্রেনে বা অন্য কোন যানবাহনে ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে রেকর্ডকৃত আযান বাজানো হয়। ছালাতের জন্য এভাবে যন্ত্রের সাহায্যে আযান দেওয়ার শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতের জন্য রেকর্ডকৃত আযান যথেষ্ট নয়। কেননা আযান একটি ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত আবশ্যক *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/১৮৮)*। তাছাড়া মুওয়াযযিনের জন্য ক্বিয়ামতের দিন অনেক মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনদের গর্দান সব মানুষের চেয়ে লম্বা ও উঁচু হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪)*। সুতরাং ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে আযান দিতে হবে। রেকর্ডকৃত আযান এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুওয়াযযিনের আযান মানুষ ও জিনসহ যে কেউই শ্রবণ করবে সেই ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সর্বোত্তম। এটা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী?

-জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী। আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি? উত্তরে তিনি বললেন, 'মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা' *(সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ জনৈক ব্যক্তির সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক হিন্দু মহিলার পরিচয় হয়। হিন্দু মহিলাটি মুসলমান হ'তে চায় এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তান আছে। এমতাবস্থায় ঐ হিন্দু মহিলাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করা যাবে কি? আর এজন্য তাকে তার পূর্ব স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে কি? হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করলে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে?

-আবুল কালাম
জাহিদ নগর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হিন্দু মহিলাকে দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিম বানিয়ে বিবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার কর্মের প্রতিদান তাকে প্রদান করবেন। শারঈ দৃষ্টিতে এজন্য পূর্ব স্ত্রীর অনুমতি আবশ্যক নয়। তবে এটা দেশে প্রচলিত সরকারী আইন। সেকারণ ফেতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য পূর্ব স্ত্রীর কাছ থেকে পরামর্শ বা অনুমতি নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১)ঃ কোন কারণবশত ছিয়াম ছুটে গেলে করণীয় কি?

-হাসান মুনশী
কাকিয়ার চর, জোড়পুকুরিয়া
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শারঈ ওযর ব্যতীত অন্য কোন কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেলে তাঁকে তওবা-ইসতেগফার করতে হবে এবং উক্ত ছুটে যাওয়া ছিয়াম পালন করতে হবে *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৪৫৫)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২)ঃ ইফতারের সময় হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করা যায় কি?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইফতারের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয় মর্মে নির্দিষ্টভাবে ইবনু মাজাহ ও মিশকাতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/২২৪৯)*। তবে ছিয়াম পালনকারীর দো'আ কবুল করা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২)*। সুতরাং কেবলমাত্র ইফতারের সময়ই নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় সারাক্ষণ দো'আ করতে হবে এটাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩)ঃ ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক লোকের স্ত্রী মারা যাওয়ায় সে কম বয়সী এক মেয়েকে বিবাহ করে। এতে তার ছেলে-মেয়েরা অসন্তুষ্ট হয়। এমনকি পিতার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করে। প্রশ্ন হ'ল, এরূপ অসম বিবাহ কি বৈধ? আর তার ছেলে-মেয়েদের অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা কি ঠিক হয়েছে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইনসান আলী
সাগরদাড়ি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ পুরুষের যদি বিবাহের প্রয়োজন থাকে তাহ'লে সে যেকোন বয়সের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। ওমর (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর মেয়ে উম্মু কুলছূমকে বিবাহ করেছিলেন *(আল-মুনতাযাম, ৪/১৩১পৃঃ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাকে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩২৫৫)*। পিতার বিবাহকে কেন্দ্র করে ছেলে-মেয়ের অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত পরিপন্থী ও নেহায়েত অন্যায় কাজ। কারণ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪)ঃ একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছেন, একটির বেশী সন্তান গ্রহণ করবে না। কিন্তু স্ত্রী তার কথায় রাযী নয়। এক্ষেত্রে কি তারা উভয়ে গুনাহগার হবে, না-কি শুধু স্বামী গুনাহগার হবে?

-আঁখি আখতার
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ গুরুতর কারণ, যেমন অসুস্থতা, মৃত্যুর আশঙ্কা ইত্যাদি ছাড়া অধিক সন্তানের ভরণ-পোষণের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা শরী'আত পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাদ্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে এবং তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' *(বনী ইসরাঈল ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অধিক প্রেমানুরাগিণী, অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী মহিলাকে বিয়ে করো। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছের অবস্থা জানতে চাই।

-নূরুল ইসলাম
বরুড়া, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইয়াযীদ ইবনু রূমান থেকে ওমর (রাঃ)-এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে তা 'মওযূ' বা জাল *(আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/১৩০২)*। পক্ষান্তরে ওমর (রাঃ) তামীম আদ-দারী ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহর ছালাত আদায় করার আদেশ করেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২)*।

Contents

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬)ঃ লাইলাতুল ক্বদরে তারাবীহর ছালাত সহ আরও নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি? উক্ত রাত্রি জাগরণের পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুন নূর
কোনাবাড়ী, গাযীপুর।

উত্তরঃ ক্বদরের নামে পৃথক নিয়তে ৮ বা ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের কোন দলীল নেই। লাইলাতুল ক্বদরে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত পড়বে। সঙ্গে বিতর পড়বে। তবে এই ছালাত সম্পন্ন হবে দীর্ঘ ক্বিরাআত, দীর্ঘ রুকূ ও দীর্ঘ সিজদার মাধ্যমে। এভাবে চার রাক'আত আদায়ের পর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে পুনরায় পূর্বের ন্যায় চার রাক'আত আদায় করবে। আর এই বিরতির সম্পূর্ণ সময় তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৩৬৮)*। এতদ্ব্যতীত বেশী বেশী তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলিতে দীর্ঘ ইবাদতে রত থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে এজন্য জাগাতেও উদ্বুদ্ধ করতেন *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/২০৮৯-৯০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭)ঃ পবিত্র রামাযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রি যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ এই রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে তারপর ইবাদত করা হয়। এই রাতে ওয়ায করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত?

-আবুল হুসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

উত্তরঃ ক্বদরের রাত্রি তথা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করার কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ যে তিনদিন মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়েছিলেন, সে তিনদিনের প্রথম দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সারা রাত্রি তথা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*। তিনি কোন রাত্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন এ ধরনের কোন দলীল পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত, দলবদ্ধ যিকর ও খানাপিনার আয়োজন করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রূকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহর ছালাত এবং যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই সর্বাধিক কল্যাণকর।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮)ঃ ছালাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যান্য সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম' পড়তে হবে কি? যদি পড়তে হয় তবে কোন সূরার মাঝখান থেকে তেলাওয়াত করলে কি বলতে হবে?

-হাসীবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে সূরা ফাতিহা ছাড়াও অন্যান্য সূরার শুরু থেকে পাঠ করলে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবা ব্যতীত অন্যান্য সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতেন। আর তিনি তা নীরবে পড়তেন, সরবে নয় *(আহমাদ ৬/৩০২, আবূদাঊদ ৪/৩৭ 'হরফ এবং ক্বিরা'আত' অধ্যায়)*। তবে সূরা ফাতিহার পর অন্যান্য সূরার মাঝখান থেকে তেলাওয়াত করলে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৩৭৮-৩৮০)*। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে তন্দ্রা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে মাথা উত্তোলন করলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিসে আপনাকে হাসাল? তিনি বললেন, এখনি আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হ'ল। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাওছার তেলাওয়াত করলেন *(ছহীহ মুসলিম হা/৮৯৪, 'যারা বলে সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমাংশে বিসমিল্লাহ' 'তার দলীল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯)ঃ *কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতে হবে? টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা যাবে কি?*

-শাহীন আলম
সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও চাউল যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ধান সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের কিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিশে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিশে খাওয়া যায় না। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিতর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা উচিত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬, দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২০/৪২০)ঃ সাহারী ও ফজরের সময়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?

-শামসুন্নাহার
হড়গ্রাম শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাহারী ও ফজরের ছালাতের মধ্যে ব্যবধান খুব কম। যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাহারী খেলাম, তারপর ছালাত আদায়ের জন্য গেলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ছালাত ও সাহারীর মধ্যে ব্যবধান কি পরিমাণ ছিল? তিনি বললেন, একজন ব্যক্তির ৫০ আয়াত পড়ার সময় *(নাসাঈ হা/২১৫৫)*। ছিলাতা ইবনু যোফার (রাঃ) বলেন, আমি হুযায়ফা (রাঃ)-এর সাথে সাহারী খেলাম। তারপর আমরা মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলাম *(নাসাঈ হা/২১৫৪)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহারী ও ফজরের ছালাতের মধ্যে খুব অল্প সময়ের ব্যবধান ছিল।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১)ঃ আমরা জানি ৯ যিলহজ্জ আরাফার দিবসের ছিয়াম রাখতে হয়। কিন্তু এবারে আমাদের ৮ যিলহজ্জ তারিখে সঊদী আরবে আরাফার দিবস উদযাপিত হয়েছে। এটা আল্লাহ্র বিধানের বরখেলাফ নয় কি?

-আইয়ুব ও মুসলিমুদ্দীন
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ আরাফার দিবসে ছিয়াম পালন করতে হবে এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফা দিবসের (يـوم عرفـة) ছিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আশা করি তিনি এর মাধ্যমে ছিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের এবং পরের এক বছরের পাপ মোচন করে দিবেন। আর আশূরার ছিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের পাপ মোচন করে দিবেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪২৫)*।

আরবের লোকেরা আরাফার দিবসেই ছিয়াম পালন করেছে এবং চাঁদ অনুযায়ী তা তাদের নিকট যিলহজ্জের ৯ তারিখ ছিল। এটি কোন দেশের ৮ তারিখ হ'তে পারে আবার কোন দেশের ৯ তারিখও হ'তে পারে। আরাফার দিবস সঊদী আরবে ৯ তারিখে হ'লে অন্যান্য দেশে তা ৯ তারিখে হবে, এই ধারণা সঠিক নয়। বরং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে তারিখের ভিন্নতা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সঊদী আরবে যেদিন আরাফা হবে সেদিনই ছিয়াম পালন করতে হবে, অন্য দেশের তারিখ যাই হোক না কেন।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২)ঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আব্দুর রহীম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নে কিছু খেলে কিংবা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিয়াম অবস্থায় ফজর হয়ে যায়। তারপর তিনি গোসল করেন এবং ছিয়াম পালন করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩)ঃ ইফতারের পূর্বের ও পরের দো'আ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাশেদুল ইসলাম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইফতারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে। তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি যঈফ ও দ্বিতীয়টি হাসান। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'*। অর্থঃ 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪)*। উল্লেখ্য, আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমতু... মর্মে প্রচলিত 'দো'আটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৯৪)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪)ঃ আমাদের মসজিদে একজন ইমাম এসেছেন। তিনি আহলেহাদীছ মসজিদে চাকুরী পেলে আহলেহাদীছ পন্থায় ছালাত আদায় করেন। আবার হানাফী মসজিদে চাকুরী পেলে হানাফী মতে ছালাত আদায় করেন। আমার প্রশ্ন, এরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় কিছু সময় হানাফী মতে ও কিছু সময় আহলেহাদীছ পন্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি? এদের পেছনে মুছল্লীদের ছালাত হবে কি?

-ইসলাম
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটা উক্ত ইমামের এক ধরনের নেফাকী আচরণ। ছহীহ হাদীছ বর্তমান থাকাবস্থায় ছহীহ পদ্ধতি বর্জন করে অর্থের লোভে অন্য কোন পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা আদৌ বৈধ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন সেভাবেই ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবেই ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত ১/হা/৬৮৩)*। জ্ঞাতসারে এই ধরনের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা অনুচিত। বরং যথাসম্ভব ইমাম পরিবর্তন করে নৈতিক গুণসম্পন্ন শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞাত পরহেযগার কোন ইমাম নিয়োগ করা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫)ঃ সমাজে প্রচলিত প্রবাদ 'অর্থই সকল অনর্থের মূল' কথাটি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য। দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সৈয়দ ফয়েয
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

Contents

উত্তরঃ উক্ত কথার সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াত পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ' *(তাগাবুন ১৫)*। 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ হ'তে গাফেল করে না দেয়। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৯)*। আয়াতদ্বয় দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন। সুতরাং যারা উপার্জিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার করবে তথা শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে চলবে তারাই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যারা অর্থ পেয়ে স্বীয় প্রভুকে ভুলে যাবে, অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন ও হারাম পথে বা যেকোন অকল্যাণকর পথে তা ব্যয় করবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাদের অর্থই হবে অনর্থের মূল।

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬)ঃ জনৈক আলেম বলেন, ধনীদের তুলনায় গরীবরা ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমানুল্লাহ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে দো'আ করলেন 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মিসকীনদের দলভুক্ত করুন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তারা ধনীদের ৪০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৬৪৪)*। অপর এক হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মুহাজির ফক্বীররা ক্বিয়ামাতের দিন ধনীদের ৪০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৫)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭)ঃ আমাদের গ্রামের একটি কসাইখানায় দৈনিক ২-৩টি গরু যবেহ হয়। গ্রামের এক ব্যক্তি গরু যবেহ করে এবং তার বিনিময়ে গরু প্রতি ১ কেজি করে গোশত পায়। এভাবে গোশতের বিনিময়ে গরু যবেহ করা জায়েয হবে কি? তাছাড়া কসাইগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি?

-মাহফূয আলম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ গরু যবেহ-এর বিনিময়ে হাদিয়া স্বরূপ গোশত বা টাকা নেওয়াতে শারঈ কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে কসাইগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করাতেও শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই; বরং এটা শরী'আত সম্মত। আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এক আনছারী লোক আসল, যার উপাধি ছিল আবূ শু'আইব। সে তার কসাই গোলামকে বলল, তুমি পাঁচজনের খাবার তৈরী কর। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পাঁচজনের একজন হিসাবে দাওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। আমি তাঁর চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেছি। অতঃপর সে তাঁদেরকে ডাকল এবং তাঁদের সাথে অন্য একজন লোকও আসল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আমাদের অনুসরণ করেছে। যদি চাও তো অনুমতি দাও, আর যদি চাও সে ফিরে যাক, তাহ'লে ফিরে যাবে। লোকটি বলল, না বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম' *(বুখারী, 'বেচা-কেনা' অধ্যায় হা/২০৮১)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮)ঃ কোন ব্যক্তি স্বহস্তে মলমূত্র বের করলে বা বীর্য স্খলন ঘটালে ক্বিয়ামতের দিন তার দু'হাতের আংগুল দিয়ে দশটি সন্তান বের হবে এবং এরা তার কাছে খাবার চাইবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যহীরুল ইসলাম
জয়দেবপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো হারাম। আর হস্তমৈথুনকারীকে তার কৃতকর্মের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে এবং লজ্জিত হয়ে এই বলে সংকল্প করতে হবে যে, সে ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না। প্রয়োজনে বিবাহ করবে। বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে ছিয়াম পালন করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২২/৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯)ঃ আমাদের এক প্রতিবেশী অসুস্থ। তার ছেলে-মেয়েরা তার সেবা-যত্ন করে না। তার কিছু জমি রয়েছে। এমতাবস্থায় পাশের বাড়ীর জনৈক ব্যক্তি বলেন, যদি আমাকে কিছু জমি লিখে দাও, তবে আমি তোমার সেবা করব। প্রশ্ন হ'ল, অসুস্থ ব্যক্তি সেবাকারীকে জমি লিখে দিতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অসুস্থ ব্যক্তি সেবাকারীকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে জমি বা অন্য কোন অর্থ দিতে পারে। সেবাকারী ব্যক্তি ওয়ারিছ না হ'লে অছিয়ত স্বরূপও তাকে সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দান করা যাবে। কারণ এক তৃতীয়াংশের বেশী ওছিয়ত করা বৈধ নয়। বরং এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশী *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৮৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০)ঃ রামাযান মাসে তারাবীহর ৮ রাক'আত নফল ছালাতের মধ্যে ৪ রাক'আত আদায় করে কিছু সময় কুরআন ও হাদীছ থেকে বিভিন্ন আলোচনা করে বাকী ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়। ছালাতের মাঝে এভাবে ওয়ায-নছীহত করা যাবে কি-না? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ তারাবীহর ছালাতের মাঝে মাঝে কুরআন ও হাদীছ থেকে শিক্ষামূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করাতে কোন শারঈ বাধা নেই। কেননা অনেক সময় ছালাতের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপদেশমূলক কথা বলতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১)ঃ ওযূর পর মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও পরে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' এবং তারপর সুন্নাত পড়া যাবে কি? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- গোলাম মুক্তাদির
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' এবং 'তাহিইয়াতুল ওযূ'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাহিইয়াতুল মসজিদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা শর্ত। কিন্তু তাহিইয়াতুল ওযূ-এর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা শর্ত নয়। নিষিদ্ধ জায়গা ব্যতীত যে কোন স্থানেই তা আদায় করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে বললেন, 'হে বেলাল! তুমি ইসলামের কি এমন পসন্দনীয় আমল কর যে, আমি জান্নাতের মধ্যে তোমার জুতার শব্দ শুনলাম? তিনি বললেন, দিনে-রাতে যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন করি তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি *(বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮)*। আবূ কাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু'রাকাত ছালাত আদায় করার পূর্বে না বসে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*।

সময় যদি বেশী থাকে তাহ'লে ওযূ করে মসজিদে প্রবেশের পর প্রথমে তাহিইয়াতুল ওযূ, অতঃপর তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করে ছালাতের নির্ধারিত সুন্নাত আদায় করবে। আর সময় না থাকলে নির্ধারিত সুন্নাত আদায় করলেই তা তাহিইয়াতুল মসজিদ-এর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/২৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২)ঃ মাথার চুল, গোঁফ, বগলের লোম বা নাভির নীচের লোম কেটে গোসল না করে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আবুল হুসাইন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ গোঁফ খাট করা, বগলের লোম এবং নাভির নীচের লোম পরিস্কার করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯)*। এগুলো পরিস্কার করে ধৌত না করলে বা গোসল না করলে ছালাত শুদ্ধ হবে না মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং ওযূ করে ছালাত আদায় করলেই চলবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩)ঃ রামাযান মাসে আযানের পর ইফতার করতে হবে, না সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে?

-আব্দুর রহীম
সাধুরমোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতদিন তারা ইফতার জলদি করবে ও সাহারী দেরীতে গ্রহণ করবে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। সুতরাং ইফতারের জন্য আযান শ্রবণ আবশ্যক নয়; বরং আযান প্রদানে বিলম্ব হ'লেও সূর্যাস্তের সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইফতার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪)ঃ কারো বাড়ীতে কুরআন খতম করে বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?

-ইলিয়াস আহমাদ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন মানুষের বাড়িতে কুরআন খতম করে তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এ ধরনের প্রথা ইসলামের স্বর্ণ যুগে ছিল না। আল্লাহ তা'আলা কোন কিছুর বিনিময়ে কুরআন বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(বাক্বারাহ ৪১; আলে ইমরান ২০০)*। উল্লেখ্য যে, কুরআন তেলাওয়াত একটি সৎ আমল। আর সৎ আমল পার্থিব প্রতিদান কামনা করে না। যে ব্যক্তি এর দ্বারা পার্থিব প্রতিদান কামনা করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে *(হূদ ১৫-১৬; ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫)ঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রির পর বিবাহ পড়ানোর পূর্বে (তথা শুধুমাত্র কবুল বলার পূর্বে) সহবাস করা জায়েয হবে কি?

-রঞ্জু
জানিয়ার বাগান, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণের মাধ্যমে মূলতঃ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বর-কনে উভয়ের সম্মতি পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র বাকি থাকে খুৎবা যা মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিবাহ রেজিষ্ট্রির পর সহবাস করা যাবে। এতে কোন শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬)ঃ জনৈক খত্বীব বলেন, রাতের প্রথমাংশে এবং জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহর ছালাত আদায় করা বিদ'আত। কারণ আবুবকর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তা পড়েননি। এমনকি ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকেও তা চালু ছিল না। পরে তিনি তা আলী (রাঃ)-এর পরামর্শে চালু করেন। পরবর্তীতে তিনি এটাকে বিদ'আত বলেছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করা কোন অবস্থাতেই বিদ'আত

Contents

নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় ৩ দিন জামা'আত সহকারে তারাবীহর ছালাত আদায় করেছেন। তবে ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি জামা'আতে নিয়মিত তারাবীহ আদায় করেননি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৯৫)*। শেষ রাতে একাকী তাহাজ্জুদ পড়াকে উত্তম মনে করে অথবা নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে সম্ভবত তারাবীহর জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি *(মির'আত ২/২৩২)*। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহুসংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণ করে মসজিদে নববীতে ১১ রাক'আত তারাবীহর জামা'আত চালু করেন। উল্লেখ্য যে, ওমর (রাঃ) নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ চালু করার পর একে 'সুন্দর বিদ'আত' (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَـذِهِ) বলেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩০)* আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত সর্বোতভাবেই ভ্রষ্টতা, যার পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭)ঃ ইফতার, সাহারী এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য ঘণ্টা বাজানো জায়েয কি?

-শামীম
হড়গ্রাম শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন ছালাতের জন্য মানুষকে ঘণ্টা বাজিয়ে আহ্বান করা কিংবা ইফতার ও সাহারীর জন্য ঘণ্টা বা সাইরন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা করা হয়েছে *(জুম'আ ৯, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল, না পেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইফতার করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর নামে সাইরেন, ঘণ্টা বাজানো বা মাইকে ডাকাডাকি সহ যা কিছু করা হয় এর সবই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে সাহারীর জন্য আযান দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বিলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বিলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে না পাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮)ঃ ফিৎরার টাকা এক স্থানে জমা করা এবং ঈদের ছালাত আদায়ের পর বণ্টন করা কি শরী'আত সম্মত?

-শফীকুর রহমান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিই শরী'আত সম্মত। নিজে ফিৎরা বণ্টন না করে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সমাজ প্রধানের নিকট জমা করা সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিৎর জমা করার নির্দেশ দিতেন *(বুখারী হা/১৫০৯, ১/৪৬৭ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তার ফিৎরা সরদারের নিকট ঈদের এক বা দুই দিন পূর্বেই জমা করতেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৫, ১/২৮৫, পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*। ঈদের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত ফিৎরা জমা করার সময়। অতঃপর ছালাত আদায়ের পর তা হকদারদের নিকট সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করবে *(দ্রঃ ফাৎহুলবারী ৩/৪৩৯-৪০ পৃঃ, হা/১৫০৯-১৫১০-এর আলোচনা)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯)ঃ রামাযান মাসে আমরা সমাজের লোক এক সঙ্গে ইফতার করে থাকি। কিন্তু উক্ত ইফতার ব্যবস্থায় নামাযী-বেনামাযী সকলেই খাদ্য প্রদান করে থাকে। আমার প্রশ্ন হ'ল, বেনামাযীর খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?

-মুসাম্মাৎ মাশরেক্বা
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বেনামাযীর খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত। যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা ছালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়। কারণ ছালাতের মাধ্যমে মুসলিম ও কাফের-মুশরিকের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। অনুরূপভাবে হারাম খাদ্য খাওয়া ও তা দ্বারা ইফতার করা হ'তে বিরত থাকাও আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র বস্তু ব্যতীত তিনি কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০)ঃ দাঁড়িয়ে বা চলন্ত অবস্থায় খাওয়া এবং পান করা যায় কি?

-মাযহারুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন ধরনের পানাহার বসে করাই সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৬৬, ৬৭)*। তবে কারণ সাপেক্ষে কখনো দাঁড়িয়েও পানাহার করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে চলন্ত অবস্থায় আহার করতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮)*। আলী (রাঃ) ওযূর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করতেন এবং বলতেন যে, এইভাবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পান করতে দেখেছি *(বুখারী, মিশকাত হা/৪২৬৯)*।